সেপ্টেম্বর ২০২০ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি

আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

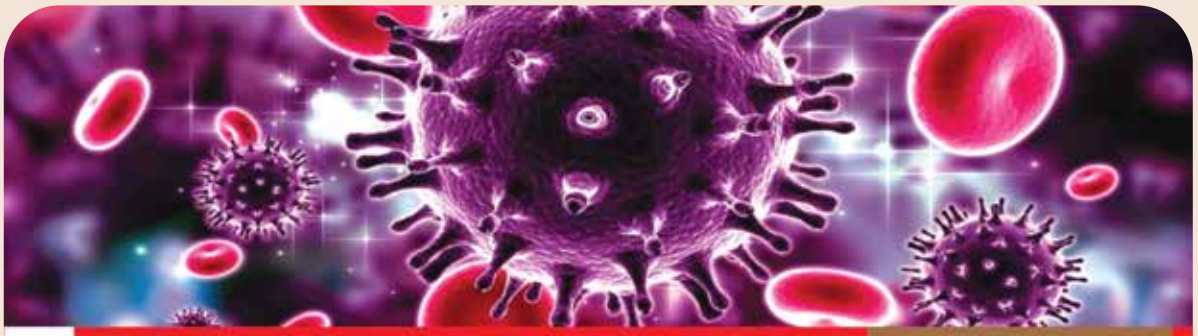

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২০ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ প্লাজার ইউনিসেফ হাউসে ইউনিসেফ প্রদত্ত 'Champion for Skills Development for Young People' পুরস্কার গ্রহণ করেন-পিআইডি

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও যোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিনে *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সময়ের এক সাহসী নারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর এক শুভলগ্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দেশ ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে তিনি আন্তর্জাতিক পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দেশ ও জাতিকে করেছেন গৌরবান্বিত। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সফল রাষ্ট্রনায়ক, সুলেখক, সংস্কৃতিমনা এবং বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা। এ নিয়ে রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস। পৃথিবীর সব মানুষের নিজেদের অন্যতম মৌলিক অধিকার শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই মূলত এই দিবসটির প্রচলন হয়েছে। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি, সে দেশ তত উন্নত। এ বিষয়ে চলতি সংখ্যায় রয়েছে একটি নিবন্ধ।

সুদূর অতীত থেকে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সম্ভাবনার দরজা খুলে যায় ১৯৭২ সালে পর্যটনশিল্প কর্পোরেশন গঠনের মধ্য দিয়ে। এই কাজটি করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রয়েছে চলতি সংখ্যায়।

নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, বাঙালিরা প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা অভিবাসী। তারা বসবাস করছে প্রায় তিনশ বছর ধরে। সেই বিচারে বাঙালিরাই এদেশের আদিবাসী। 'আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' বিষয়ে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ রয়েছে চলতি সংখ্যায়।

শরৎ ও কাশফুল একসূত্রে গাঁথা। প্রকৃতিতে যখন শরৎ আসে তখন কাশফুল ও নীল আকাশ জানিয়ে দেয় শরতের আগমনি বার্তা। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ তো রয়েছেই। আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন: নেতৃত্বের আলোকদ্যুতি ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

শেখ হাসিনার আহ্বানে জেগে ওঠে বাঙালি ৬
শাফিকুর রাহী

স্মরণে কালজয়ী কবি, গীতিকার ও সংগীতসাধক গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ৮
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

শুভ জন্মদিন হে মনীষা ১০
সৈয়দ শাহরিয়ার

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি ১১
ড. মোহাম্মদ হাননান

বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বে শীর্ষবিন্দু স্পর্শী শেখ হাসিনা ১৫
মিলন সব্যসাচী

কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর ১৭
নাসরীন মুস্তাফা

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ভালোবাসা ১৯
লিলি হক

যে উচ্চারণে সূর্যস্নান ২০
পারভিন আক্তার

শেখ হাসিনার অর্জন ২২
শামসুজ্জামান শামস

৭ই মার্চের ভাষণ ধারণের অডিও-ভিডিও যন্ত্র ডিএফপি'র জাদুঘরে ২৪
মোহাম্মদ আলী সরকার

সাক্ষরতায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ২৫
সাইমন ইসলাম সাগর

রবীন্দ্রনাথ এক আলোকবর্তিকা ২৭
ফারিহা রেজা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২৯
কে সি বি তপু

আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৩১
সানিয়াত রহমান

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প ৩৩
মো. খালিদ হোসেন

কাশফুল: শরতের আগমনি বার্তা ৩৫
হামিদা খাতুন

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ রোল মডেল ৩৬
সুস্মিতা চৌধুরী

রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ ৩৮
সৈকত নন্দী সৌখিন

হাইলাইটস

সিডও দিবস ও বাংলাদেশের নারী ৩৯
মো. শহিদুল ইসলাম

একাত্তরের রণাঙ্গনে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ৪০
পান্নু চন্দ্র দে

ওজোন স্তর সুরক্ষায় চাই সচেতনতা ৪১
শিহাব শুভ

প্লাস্টিক দূষণরোধে সরকারের পদক্ষেপ ৪২
জেসিকা হোসেন

গল্প

রক্তের ঋণ ৪৩
দেলোয়ার হোসেন

কবিতাগুচ্ছ ৪৫, ৪৬, ৪৭
সোহরাব পাশা, সৈয়দা রাবেয়া
মিয়াজান কবীর, শাহনাজ
আতিক আজিজ, গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন
মিজানুর রহমান মিথুন, শাহরিয়ার নূর
অদ্বৈত মারুত, অমিত রেজা, সুষমা ফাল্গুনী
নুসরাত জাহান, মোছা. শাম্মী আখতার
মুহাম্মদ ইসমাঈল, মো. জামাল উদ্দিন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৮
প্রধানমন্ত্রী ৪৯
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
আন্তর্জাতিক ৫১
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৪
নারী ৫৪
বিনিয়োগ ৫৫
কৃষি ৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
বিদ্যুৎ ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
কর্মসংস্থান ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
যোগাযোগ ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩
না ফেরার দেশে সুরকার আলাউদ্দিন আলী ৬৪
আফরোজা রুমা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন: নেতৃত্বের আলোকদ্যুতি

বঙ্গবন্ধুকন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বজন হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে সফলতার উচ্চতায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। তিনি ১৯৯৬, ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এই গৌরবের অধিকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা হয়েছে– কবিতা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গান। তিনি দেশের অগ্রযাত্রায় অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, অর্জন করেছেন সম্মান ও মানুষের ভালোবাসা। তাঁর ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে 'শেখ হাসিনার জন্মদিন: লোকলক্ষী নেতৃত্বের আলোকদ্যুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর দশকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-আন্দোলন প্রথম সরব হয়ে ওঠে ১৯৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে। এরপর ১৯৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে ছাত্ররা আবার আন্দোলন শুরু করে পাকিস্তানের তথাকথিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৯৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে গণবিরোধী শরিফ শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তা ছিল সর্বগ্রাসী। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তৎকালীন সামরিক সরকার মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিল ছাত্রসমাজের কাছে। গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল হয়েছিল। ১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা-ই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। তখন ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলার স্বায়ত্তশাসন ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সফলতা পায়। এ বিষয়ে 'ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১১

আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদেশে বাঙালিরা 'মূল আদিবাসী' বলে গবেষকরা মনে করেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের 'আদিবাসী'। তারা প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এদেশে বসবাস করছে। আর ঐতিহাসিক তথ্য মতে, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ঘটেছে ১৭২৭ সাল থেকে। তারা এ অঞ্চলে অভিবাসী হিসেবে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার এদেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণকে আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়ে 'আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৩১

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প

প্রাকৃতিক নৈসর্গিক লীলাভূমি খ্যাত বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে বর্তমান সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ২৫ লাখ পর্যটক আসার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকল্পে প্রত্যাশিত অবকাঠামো উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত বিনোদন বিকাশের সুযোগ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পর্যটন এলাকায় হোটেল বৃদ্ধি এবং পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা, যা পর্যটন খাতকে আরো উন্নত ও গতিশীল করবে। দেশের পর্যটনশিল্প নিয়ে 'বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৩৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন: নেতৃত্বের আলোকদ্যুতি

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শেখ হাসিনা একটি অবিস্মরণীয় নাম এবং বিশ্বের ইতিহাসে নারী নেতৃত্বের অসীম সাহসী বীরকন্যা। তাঁর অন্য পরিচয় বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি ও চারবারের প্রধানমন্ত্রী। আর বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে লোকলক্ষ্মী প্রাণপ্রতিমা।

শেখ হাসিনার জন্মদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর, ভারত বিভক্তির সেই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি তখনকার গোপালগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণে অবস্থিত এবং মধুমতী ও ঘাঘোর নদীবিধৌত টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বনেদি শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন ইরাকি সুফি দরবেশ শেখ আউয়ালের উত্তরসূরি। প্রায় পাঁচশ বছর শেখদের বাংলাদেশে অবস্থান এবং টুঙ্গিপাড়ায় সাড়ে তিনশ বছর স্থিতি। সেকালে টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করে ব্যাবসা-বাণিজ্যে ও শিক্ষাদীক্ষায় স্থানীয়দের ছাড়িয়ে যান। কোম্পানি আমলে এ অঞ্চলে নীলকরদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেন শেখ পরিবার। এই শেখ পরিবারের শেখ আউয়ালের উত্তরসূরি শেখ আবদুল হামিদের ছেলে শেখ লুৎফর রহমানের আদরের নাতনি শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনার শৈশবের দিনগুলো কেটেছে টুঙ্গিপাড়ার সবুজ শ্যামল ছায়ায়। ঘরের পাশেই জল ছলছল খাল, খালে ফোটা শাপলা ফুল, গাবগাছে লুকিয়ে থাকা পাখপাখালি এবং অদূরে দাদাদের গড়া স্কুলের স্মৃতি আজো তাঁকে আবেগতাড়িত করে। আট বছর বয়সে বাবার মন্ত্রী হবার সুবাদে ঘর-গেরস্তির মায়া ত্যাগ করে দাদি সায়েরা খাতুন ও মা রেণুর সঙ্গে প্রথম ঢাকা আসেন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাবা রাজনীতি করতেন মানুষের জন্য। রাজনীতি করলে জেলে যেতে হয়, মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়– শেখ হাসিনা সেই আট বছর বয়সেই বুঝেছিলেন। শিক্ষাজীবনে এর প্রভাব পড়েছিল কারণ পুরো পরিবারই রাজনৈতিক আবহে বিদ্যমান। কিন্তু নারী শিক্ষাবান্ধব আজিমপুর গালর্স স্কুল, বদরুন্নেসা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ঠিকই করেছিলেন। তখন চলছিল বাংলার জনগণের জন্য প্রণীত ছয় দফা আদায়ে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও স্বাধিকারের আন্দোলন। গোটা বাংলায় বইছে বঙ্গবন্ধুর বিপ্লবী জোয়ার। শেখ হাসিনা সেই আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। আটষট্টিতে গৃহবধূ হলেন। এরপরের ইতিহাসের অংশীদার নিজেই। ১৯৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এ নির্বাচন, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ–সবকিছুর মহানায়ক বঙ্গবন্ধু। মুক্তিযুদ্ধের সময় মায়ের সঙ্গে বন্দি ছিলেন শেখ হাসিনা। দুর্বিষহ জীবনেই নারীসত্তা বিকশিত করলেন প্রথম সন্তান জন্ম দিয়ে। দেশ স্বাধীন হলো, পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। শেখ হাসিনা ভুলে গেলেন দুঃখ-বেদনা। বাংলাদেশ তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানিরা শুধু বাংলায় পোড়ামাটি রেখে আত্মসমর্পণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ওআইসি, পাকিস্তান, জাতিসংঘের স্বীকৃতি আদায় করলেন। মিত্র সৈন্যদের স্বদেশে পাঠালেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি করলেন ভারতের সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান দিলেন। কৃষকের পরিবারের জন্য খাজনা মওকুফ ও সিলিং নির্ধারণ করলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ধারা সংবিধানে প্রতিস্থাপন করলেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ছিল তক্কে তক্কে। তারা অরাজকতা সৃষ্টির পায়তারা করছিল। ১৯৭৪-এ পিএলও-র খাদ্যশস্য এল না। একদিকে জাসদের উৎখাত অন্যদিকে হক, তোহা, ভাষা মতীন ও সিরাজ শিকদারদের পাঁচ জন জাতীয় সংসদ সদস্যের হত্যায় বঙ্গবন্ধু অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি শান্তি, কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি রক্ষার লক্ষ্যে সবাইকে একমঞ্চে শামিল হয়ে দেশ গড়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি শেখ হাসিনার চোখের সামনেই ঘটেছে। ঘরের বউ লক্ষ্মী হয়ে এসব অবলোকন করেছেন। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুলাই স্বামীর সঙ্গে ছোটোবোন ও সন্তানদের নিয়ে পাড়ি জমালেন জার্মানিতে আর ফিরে এলেন এতিম হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে। বাংলাদেশ তখন মোশতাক ও জিয়ার বদৌলতে হাফ পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা চলে গেছে সেনানিবাসে। গণতন্ত্র ও সংবিধান আস্তাকুঁড়ে। দেশে ফিরে শেখ হাসিনা মানুষের অঙ্গীকার আদায়ে নিরন্তর সংগ্রাম করলেন। তাঁর চতুর্দিকে স্বাধীনতা স্বপক্ষের লোক ছাড়া সবাই শত্রু-বিভীষণ। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে মেরে ফেলার সমূহ উদ্যোগ। তাঁকে বাঁচতে হয়েছে পরম বিধাতা ও বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ বিশ্বাসী মানুষজনদের শক্তিসাহসের ওপর ভর করে। অবশেষে ১৯৯৬ সালে তাঁর আন্দোলন সফল ও সংগ্রামের প্রথম বিজয় হয়। একাত্তরের শত্রুদের পর্দার আড়ালে পলায়ন। এ যাত্রায় তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নগুলোর ভিত রচনা করলেন এবং পরের পাঁচ বছর বাদে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করে তাঁর স্বপ্নগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

বিগত বছরগুলোয় পাহাড়ি সমস্যার সমাধান, পানি চুক্তি, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ, পদ্মাসেতু নির্মাণ (নির্মাণাধীন) বঙ্গবন্ধুর খুনি ও একাত্তরের খুনিদের বিচার এবং ছিটমহল সমস্যা সমাধান, সমুদ্র বিজয়, একুশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রেরণ, রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দান, দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন,

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা শেখ হাসিনারই অবদান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, আদর্শ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার জন্য তাঁর দিনরাত কাটে। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তিনি ঘুমান না। বৈরী পরিবেশেও প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট ও ঘণ্টা অতিবাহিত করেন দেশের মানুষের জন্য।

তাইতো আমরা জোর গলায় বলতে পারি– তাঁর জন্মদিন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। তাঁর অভিযাত্রায় আমরা নতুন দিগন্তের সীমানা খুঁজে পাই। তিনি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও গৌরব। তাঁকে ঘিরেই আমাদের জীবন। তাঁর দীঘল আঁচলের ছায়ায় বাংলাদেশের পথঘাট, প্রান্তর এবং সজীব প্রাণিকুল। একারণেই তিনি লোকলক্ষ্মী। দৃঢ় চিত্তের অধিকারী, দূরদর্শী ও প্রচণ্ড আবেগময়ী শেখ হাসিনা। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলেই সেখানে দয়ার হাতটি বাড়িয়ে দেন তিনি। মানুষকে সেবা করতে পারলেই খুশি। মানুষের কল্যাণই তাঁর বড়ো ধর্ম। আর এদেশের মানুষও তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসেন। এই ভালোবাসার কারণেই শেখ হাসিনা বেঁচে আছেন।

ভাবলে অবাক হতে হয়, তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ড, সাহিত্য জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও মানুষের ভালোবাসার গুণকীর্তন নিয়ে শত শত গ্রন্থ, পুস্তিকা ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত হয়েছে শত শত কবিতা ও ছড়া। এদেশের সকল নামিদামি লেখক তাদের রচনায় শেখ হাসিনার আর্তি প্রকাশ করেছেন। যেমনটি হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও। তাঁকে নিয়ে রচনা হয়েছে হাজার হজার বই, তা আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শেখ হাসিনাকে নিয়ে গদ্যে-পদ্যে অনেক বই লেখা হয়েছে। যাদের লেখায় শেখ হাসিনার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, শওকত ওসমান, কবীর চৌধুরী, শেখ ফজুলল করিম সেলিম, সিরাজউদদীন আহমেদ, সৈয়দ আবুল হোসেনর, শেখ রেহানা, সুলতানা কামাল, শিল্পী হাশেম খান, সেলিনা হোসেন, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, বেলাল চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, ইয়াফেস ওসমান, কাজী রোজী, খালেক বিন জয়েনউদদীন, ইমদাদুল হক মিলন, আমিনুর রহমান সুলতান, গোলাম কুদ্দুস, তাহমিনা কোরাইশী, আসলাম সানী, দীলতাজ রহমান, নাসির আহমদ, মো. লিয়াকত আলী মোল্লা, আলমগীর রেজা চৌধুরী, নুরুন্নাহার শিরিন, ফরিদ আহমদ দুলাল, মহাদেব সাহা, বীনা সিক্রী, মহম্মদ নুরুল হুদা, ড. আবদুল ওয়াহাব, ড. শফিক সিদ্দিক, রফিক আজাদ, শওকত মোমেন শাহজাহান, শিহাব সরকার, সুজন বড়ুয়া, ফারুক নওয়াজ, হারুন হাবীব, ড. তপন বাগচী, হালিম আজাদ, লুৎফর চৌধুরী, অনিল সরকার, রবিউল হুসাইন, পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, মহাম্মদ সামাদ, সালাহউদ্দিন বাদল, আয়াত আলী পাটোয়ারী, এম আর মঞ্জু, হারিসুল হক, মুনতাসীর মামুন, তোফাজ্জল হোসেন, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান আজিজ, পান্না কায়সার, অসীম সাহা, জাহিদুল হক, আইউব হোসেন, সোহরাব পাশা, দুখু বাঙাল, কামাল চৌধুরী, মিনার মনসুর, আবুল আজাদ, আনিস মুহম্মদ, আমিরুল ইসলাম, তারিক সুজাত, শামস সাঈদ, কাজী মোহিনী ইসলাম, মোহাম্মদ ইল্ইয়াছ, বশিরুজ্জামান বশির প্রমুখ।

গ্রন্থিত ছড়া, কবিতা ও প্রবন্ধে আমাদের খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। কীর্তন নয়, তাঁর গুণের কথাই বর্ণনা করেছেন। নিচে নামজাদা লিখিয়েদের ভালোবাসার পঙ্‌ক্তিমালার কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

আজ কী আনন্দ অপার
আহা, আজ কী আনন্দ অপার
শুভ শুভ জন্মদিন, দেশরত্ন শেখ হাসিনার
জয় জয় জয় জয় বাংলা,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বপ্নবাহু তাঁর
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
পঁচাত্তরের কলঙ্কিত সেই রাত্রির পর
নৌকা ডোবে নদীর জলে
সবাই বলে নৌকা তুলে ধর
কেইবা তোলে কে আসে আর
স্বপ্নবাহু তাঁর
বঙ্গবন্ধু কন্যার
শুভ শুভ জন্মদিন দেশরত্ন শেখ হাসিনার
–সৈয়দ শামসুল হক

পথে পথে পাথর
শেখ হাসিনা, আপনার বেদনা আমি জানি
জানি, দুঃখ রজনী ফুরাতে চায় না সহজে।
শেখ হাসিনা, আপনার বেদনা আমি জানি
আপনার প্রত্যাবর্তন আজও শেষ হয়নি
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সিঁড়িতে
আপনি পা রেখেছেন মাত্র।
আপনার পথে পথে পাথর ছড়ানো
পাড়ি দিতে হবে দুর্গম গিড়ি, কান্তার মরুপথ।
–নির্মলেন্দু গুণ

ভেতরের চোখ
তাঁর চোখে বাংলাদেশ
যে চোখ মলিন হলে অসমাপ্ত দিন
যে চোখ কাতর মানে ফোটে না তো ফুল
সেই চোখে অশ্রু নিয়ে শোকার্ত স্বদেশ
কুয়াশায় মোহাচ্ছন্ন তরুলতা, প্রাণী...
তাঁর চোখে কথা বলে চলে
যেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল।
কে এমন দুর্যোধন আগুনে আগুন নিয়ে খেলে?
কে এমন ইয়াজিদ শূন্য করে পানির নহর?
পনেরো কোটির দেশে তুলকালাম হৃদয়ের দাম!
–হাবীবুল্লাহ সিরাজী

শেখ হাসিনাকে নিবেদিত আমাদের কবিকুলের কবিতায় রয়েছে নানা ছবি, নানা আর্তি। কোনোটিতে শ্রদ্ধা, কোনোটিতে ভালোবাসা, মমতা এবং তাঁর মঙ্গল কামনার বর্ণনা গদ্যে-পদ্যে শোভিত হয়েছে। স্বপ্ন ও জাগরণে রাখিবন্ধনে তা নানাভাবে গ্রন্থিত।
শেখ হাসিনা বাঙালি জনগোষ্ঠী ও এই জনপদের কাণ্ডারি। আমাদের সেই দুঃসময়ের আলোকদ্যুতি। দেশের কল্যাণে তাঁর জীবন নিবেদিত। এখনো তিনি সংগ্রামের সরণিতে দণ্ডায়মান। তিনি প্রায় বলেন, বাবার মতো আমাকেও যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, আমি তা করতে প্রস্তুত। এমন সাহসী উচ্চারণ মুজিবকন্যার পক্ষেই সম্ভব। আমরা জানি, তাঁর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। আমাদের নিয়েই তাঁর অভিযাত্রা। আমরা তাঁর ৭৪তম জন্মদিনে দীর্ঘজীবন কামনা করি পরম বিধাতার কাছে।

লেখক: সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

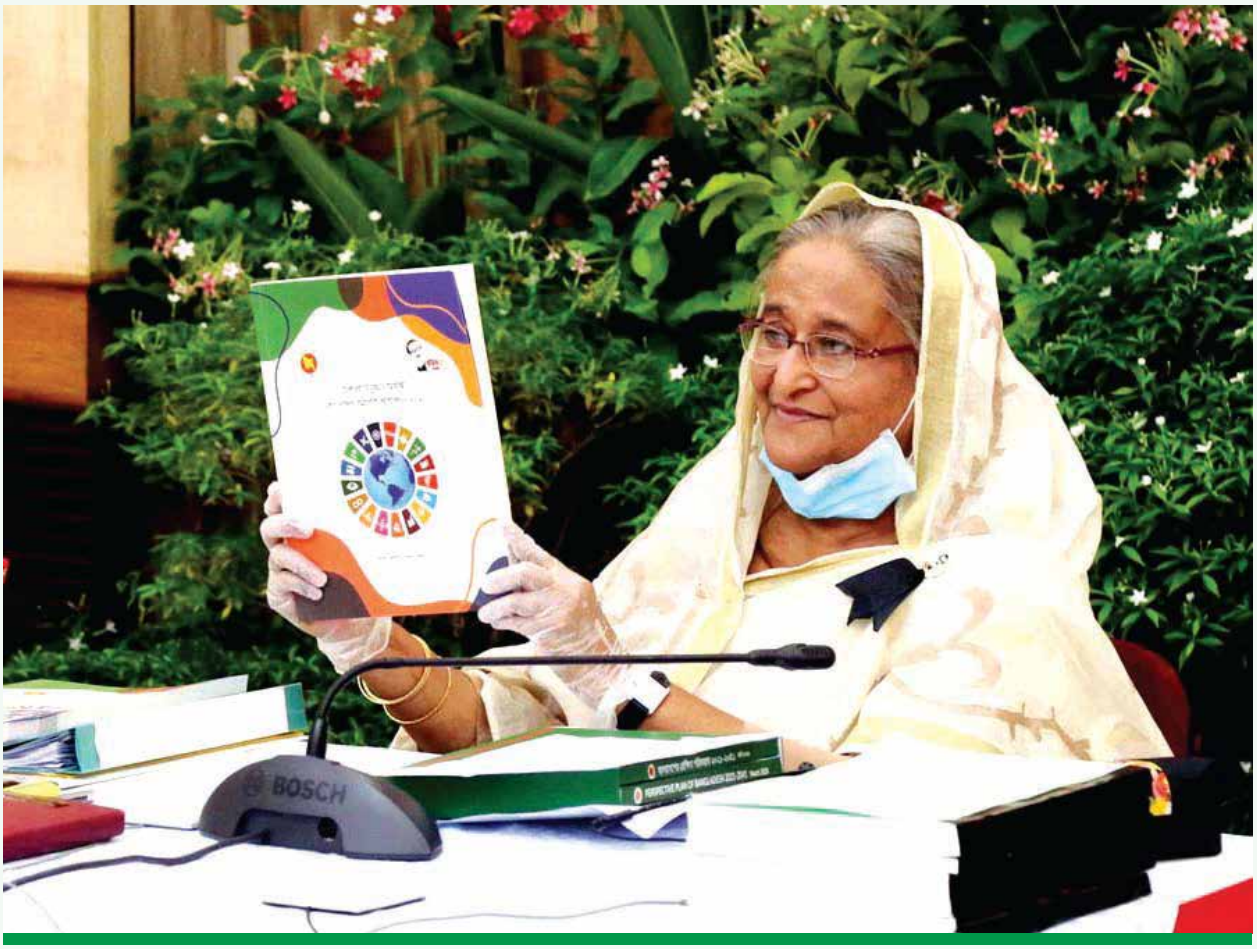

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একনেক সভায় 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট : বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন

শেখ হাসিনার আহ্বানে জেগে ওঠে বাঙালি

শাফিকুর রাহী

বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন আর ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার এবং যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান। অথচ ১৯৭৫-এর ভয়ানক কালরাতে সেই মহান নেতার বুকে গুলি ছুঁড়ল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক বিশ্বাসঘাতক কতিপয় সেনাসদস্য। সে সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা প্রবাসে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। শেখ রেহানাকে নিয়ে শেখ হাসিনা জার্মানিতে অবস্থানরত খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী তাঁর স্বামী ড. এম ওয়াজেদ মিয়ার কাছে বেড়াতে যান। ১৫ই আগস্টের পর তাঁদের দুজনের জীবনে নেমে আসে দুঃসহ দুর্গতির ভয়ানক আঁধার।

শেখ হাসিনা সে ভয়াবহ আঁধার ভাঙার দৃঢ় সংকল্পে বলীয়ান হয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাণের বাংলায় আপন আবাসভূমিতে ফেরার অঙ্গীকার করলেন। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রবাস থেকে ফিরে এলেন আপন মাতৃভূমিতে। এর আগেই ১৯৮১ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার ঐতিহাসিক হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। মুজিবপ্রেমী জনগণের পরম ভরসা তাঁরই সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা।

আবেগীয় অশ্রু আর প্রাণের টানে বঙ্গবন্ধুপ্রেমী গণমানুষ সেদিন বরণ করে নেন স্বজনহারানো বঙ্গবন্ধুকন্যাকে। সে প্রত্যাবর্তনের সুবর্ণকালে মানুষ পরম ভালোবাসায় স্বপ্নবীজ বপন করে জেগে উঠল জাতির পিতার মহান আদর্শে। জননেত্রীর দুঃসাহসী উচ্চারণে জনতা আবার প্রতিজ্ঞা করল দুঃশাসন আর দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দীর্ঘ দুঃসহ অন্ধকার ভেঙে পরবাস থেকে ফিরে এসে ডাক দিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষকে জেগে উঠতে। তিনি আরো বললেন যে, 'আমি আমার সকল স্বজনকে হারিয়েছি, আমার আর হারাবার কিছু নেই, চাওয়া-পাওয়ারও তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই'।

'আমি এখন আপনাদের মাঝে আমার হারানো সকল আপনজনকে দেখতে পাই। আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বাস, জাতির পিতার হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে আমাকে

অনুপ্রাণিত করবে, উজ্জীবিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। আপনারা বিবাদ বিভাজন ভুলে গণসচেতনতা গড়ে তুলবেন। আমি আমার বাবার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠলে কোনো বাধাই আমাদের শুভবাদের গতিপথ রোধ করার সাহস পাবে না'।

বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকে তাঁর নানান মানবিক উদ্যোগের ফলে অধিকার বঞ্চিত মুজিবপ্রেমী সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল। এরই ফলে আবার রুখে দাঁড়াল বঙ্গবন্ধুর বাঙালি।

শেখ হাসিনার অপ্রতিরোধ্য সফল অভিযানের ফলে দেশ আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জনে বাংলার আপামর জনগণের মলিন অবয়বে হাসি ফুটতে শুরু করেছে। তিনি যেভাবে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আশা করা যায় এ যুদ্ধেও সফলকাম হবেন। তিনি আজ বিশ্বনেতার অমূল্য খ্যাতি অর্জনে বাঙালি জাতিকে করেছেন গৌরবান্বিত। তাঁর মানবিক গুণাবলি বিশ্বের অনেক নেতার নিকট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ব নেতাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরাধিকারী শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের অন্যতম নেতার আসন অলংকৃত করেছেন তাঁর মেধায়-প্রজ্ঞায়, গণমানুষের ভালোবাসায় আর বিশ্বাসে। তিনি বীর বাঙালির হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবনের যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন তাতে সফলও হয়েছেন। তিনি বিকশিত করেছেন বাংলার হারানো ইতিহাস-ঐতিহ্যকে, তিনি কঠিন পরিশ্রম করে অকাতরে কর্মসৃজন করে চলেছেন আপন টানে, আপন মহিমায় বাধাহীন আঁধারকে জয়ের স্বপ্ন সম্ভাবনায়। তিনি এ বয়সেও ক্লান্তিহীনভাবে মাটি ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র, দক্ষিণ এশিয়া গর্ব করবে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রকে নিয়ে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পিতার সে স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যে এর সুফল দেশের জনগণ ভোগ করছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকারপ্রধানের দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে পালন করে আসছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দিক হলো তিনিই একমাত্র নেতা যাঁর বড়ো বড়ো সাফল্য রয়েছে অনেক। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা ও সার্থকতা হলো তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রায় চার দশকেরও অধিককাল পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত বেশ কয়েকজন খুনির বিচারের রায়ও অত্যন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করেছেন, যা দেশ-বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্বতসম দুঃখ-কষ্টকে ধারণ করে দীর্ঘশ্বাসকে সঙ্গী করে বাংলার মানুষের ভালোবাসায় স্বজনহারার শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অভিযান পরিচালনা করছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পুনরুদ্ধারের দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার অসমাপ্ত কর্মযজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাঁর আজকের এই উত্থানের পেছনের পথ ছিল অত্যন্ত বিপৎসংকুল। তিনি বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন কিন্তু কখনো কোনো শত্রুর সঙ্গে আপোশ করেননি। কারণ তিনি প্রায় বলে থাকেন যে, 'আমি এদেশের শুধু প্রধানমন্ত্রীই নই, আমি বঙ্গবন্ধুকন্যা, আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতির পিতা, আমি তাঁর মহান আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এদেশকে বিশ্ব দরবারে একটি সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যেতে চাই, আমি সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি'।

দেশের জনগণ এখন আগের তুলনায় অনেক ভালোভাবে জীবনযাপনের সুযোগ পাচ্ছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আজ দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ। 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খ্যাত বিশ্বনেতা শেখ হাসিনার প্রাণোচ্ছল সাবলীল শব্দ সম্ভাষণে জেগে ওঠে বাংলার অবহেলিত জনপদের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ। তিনি আজ বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে স্থান করে নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য সন্তান আজ 'বিশ্ব মানবতার জননী'র খ্যাতি অর্জন করে বাংলার মানুষকে করেছেন মহিমান্বিত।

বর্তমান বিশ্বে শেখ হাসিনা একজন সফল রাষ্ট্রনায়কই শুধু নন, তিনি তাবৎ বিশ্বকে চমকিত করেছেন তাঁর জনকল্যাণমূলক নানা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। জনদরদি নেতা শেখ

গণভবনে জনবান্ধব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লেখক

হাসিনা তাঁর প্রবল প্রজ্ঞায় স্বদেশের পবিত্র জমিনে ভয়ানক অন্ধকারে আলোর স্বপ্নসারথি হয়ে জ্যোতির্ময় প্রভায় বিকশিত করলেন অধিকার বঞ্চিত গণমানুষের মনোলোক। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ছুড়ে দিয়েছেন দুঃসাহসী অঙ্গীকারে। তাঁর স্বপ্নসাধনা আশাহত গরিব-দুঃখি মানুষের মলিন অবয়বে হাসি ফোটানো। সে অপ্রতিরোধ্য অভিযান আজো অব্যাহত রয়েছে।

দেশবাসী বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুকন্যা এ মানবিক অগ্রযাত্রায় আরো সফলতার সোনালি সাক্ষর রাখবেন। জয়তু মানবতার মাতা– আপনার জয় হোক, জয় হোক সকল শ্রমজীবী মানুষের। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের প্রত্যাশায় আমরা রবের দরবারে সদা প্রার্থনারত। বিশ্ববিবেক বিদগ্ধজন আপনার মেধা-প্রজ্ঞায়, আপনার মাটি ও মানুষের প্রেমে মুগ্ধপ্রায় অভিনন্দিত করে পরম শ্রদ্ধায়। আপনার মানবিক শুভবাদের জয় অনিবার্য।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও ক্ষুদ্রপ্রাণ মুজিবপ্রেমী

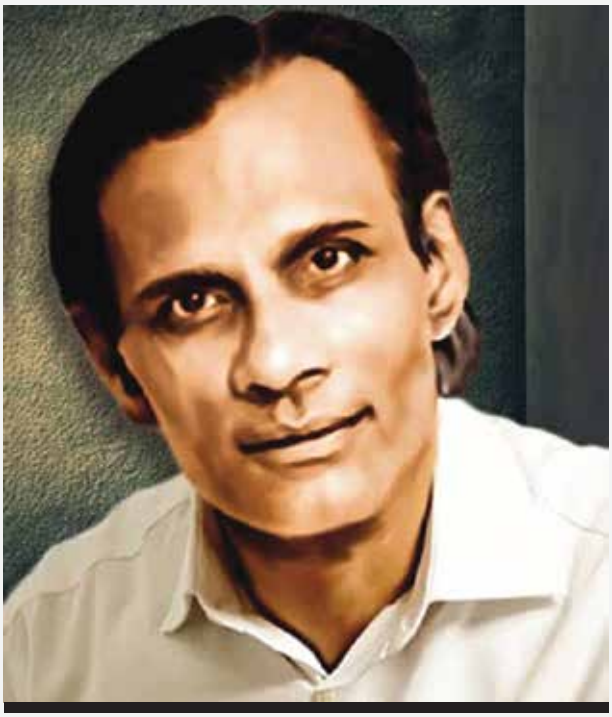

স্মরণে কালজয়ী কবি, গীতিকার ও সংগীতসাধক গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

স. ম. গোলাম কিবরিয়া

'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে ওঠে রণি, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'। মহান মুক্তিযুদ্ধকালে প্রেরণাদায়ী এ গানটির রচয়িতা প্রখ্যাত গীতিকার ও সংগীতসাধক গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে বাজানো হয় এ গানটি। গানটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয় 'মিলিয়ন মুজিবস সিংগিং' শিরোনামে। ইংরেজি অনুবাদ করেন গৌরীপ্রসন্ন নিজেই। তাঁর লেখা আরো একটি গান মুক্তিযুদ্ধকালে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা এবং রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। গানটি হলো– 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি'। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করে। ২০শে আগস্ট নীরবেই চলে গেল বরেণ্য এ শিল্পীর ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে গুণী এ শিল্পীর পরিচয় তুলে ধরাই এ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯২৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'বাচ্চু' তাঁর ডাক নাম। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বিশিষ্ট উদ্ভিদবিদ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদারের সন্তান গৌরীপ্রসন্ন শৈশবেই পরিবারের সঙ্গে কলকাতা চলে যান। শৈশব থেকেই কবিতা ও প্রবন্ধ লেখার প্রতি গৌরীপ্রসন্নের প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ছাত্রজীবনের গণ্ডি পেরোনোর আগেই তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কালীদাসের *মেঘদূত*। সে সময়েই তাঁর বাংলা কবিতা লেখা শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফিরে এসে পাবনা শহরের মজুমদার পাড়ায় বসবাস শুরু করেন। এসময়ে ভর্তি হন সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময়ই শুরু করেন গান লেখা। ১৯৫১ সালে পুনরায় কলকাতা চলে যান তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাস করেন। পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সভাপতি বন্ধু অরুণ মিত্র ও সুরকার নচিকেতা ঘোষের উৎসাহেই গান লেখা তাঁর। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তাঁর লেখা গান প্রথম রেকর্ড হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা যায় প্রথম গান– 'আকাশ মাটি ঐ ঘুমালো, ঘুমায় মেঘ তারা'। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় রচনা করেন 'বঁধু গো এই মধুমাস'। শচীন দেববর্মণ তাতে সুরারোপ করে প্রথম রেকর্ড করেন। এরপর তিনি চলচ্চিত্রের জন্য গান লেখা শুরু করেন। *অগ্নিপরীক্ষা*, *পথে হলো দেরি*, *হারানো সুর*, *সপ্তপদী*, *দেয়া নেয়া*, *মরুতীর্থ হিংলাজ*সহ বহু সিনেমায় তাঁর লেখা গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

শচীন দেববর্মণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে গৌরীপ্রসন্নের। 'মেঘ কালো আঁধার কালো', 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে,' 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই'– গৌরীপ্রসন্নের কথায় ও শচীন দেববর্মণের সুরে সৃষ্টি হয়েছিল এমন অসংখ্য কিংবদন্তি গান। তাঁর অসংখ্য অমর সৃষ্টি আমাদের সংগীতকে করেছে সমৃদ্ধ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গানে সুর দিয়েছেন সত্য চৌধুরী, ভক্তিময় দাসগুপ্ত, অপরেশ লাহিড়ী, সুধীর লাল চক্রবর্তী, নচিকেতা ঘোষ, অনুপম ঘটক, রবীন চট্টোপাধ্যায়। শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে-সহ অনেকে তাঁর লেখা গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। 'কফি

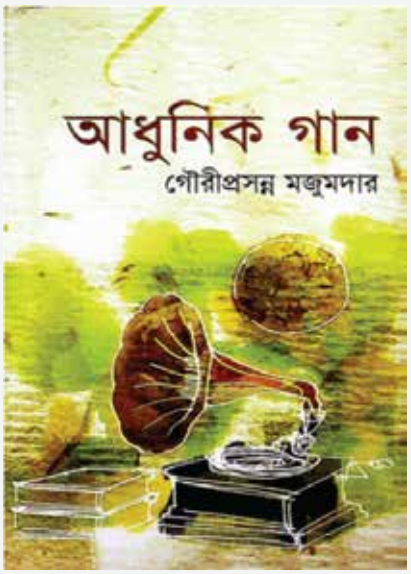

হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'– মান্না দের গাওয়া এই কালজয়ী গানটির রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ২০০৪ সালে

প্রখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের সঙ্গে শিল্পী রথীন রায় ও লুৎফর রহমান

বিবিসি'র জরিপে গানটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানের মধ্যে স্থান পায়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার চলচ্চিত্রের গান ছাড়াও অনেক গণসংগীত রচনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগৎ যাঁরা মাতিয়ে রাখতেন, গৌরীপ্রসন্ন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি চেষ্টা করি একেক সুরকার ও গায়কের জন্য একেক রকম গান লিখতে'। বাঙালি গীতিকার হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি অনেক ইংরেজি গানও লিখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি*র গীতিনাট্য রূপ দেন লোকগানের প্রশিক্ষক ও গায়ক দীনেন্দ্র চৌধুরী, আর তা অপরিবর্তিত রেখে গীতিনাট্যটির ইংরেজি অনুবাদ করেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁর লেখা রোমান্টিক গান সে সময় বাংলা চলচ্চিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো'– উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের ঠোঁটে এই গান তখন দর্শকদের অন্য এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যেত।

বিখ্যাত সব কালজয়ী গানের অমর স্রষ্টা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। 'আমার গানের স্বরলিপি', 'গানে মোর ইন্দ্রধনু', 'মা গো, ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে', 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি', 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার দেশ', 'এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায় এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু', 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন', 'কেন দূরে থাকো শুধু আড়াল রাখো কে তুমি কে তুমি আমায় ডাকো', 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো', 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে', 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে'– এমনই সব জনপ্রিয় গানের রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

প্রায় দশ বছর ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯৮৬ সালের ২০শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন বরেণ্য এই গীতিকার। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে তিনি লিখেছিলেন– 'যেতে দাও আমায় ডেকো না, কবে কি আমি বলেছি মনে রেখ না'। তাঁর মৃত্যুর পর গানটি শিল্পী আশা ভোঁসলের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়। হাসপাতালের শয্যায় তাঁর লেখা শেষ গান– 'এবার তাহলে আমি যাই, সুখে থাক ভালো থাক, মন থেকে এই চাই'। আধুনিক বাংলা গানের গীতিকার হিসেবে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। এই বরেণ্য সংগীতজ্ঞের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর অসামান্য অবদান ও স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক : মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

আমেরিকায় জাতির পিতার ভাস্কর্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে যুবলীগের উদ্যোগে ডেট্রয়েট সিটির বাংলাদেশ এভিনিউতে নির্মাণ করা হয়েছে জাতির পিতার ভাস্কর্য। ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যায় ভাস্কর্যটি উদ্‌বোধন করেন মিশিগান কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট ১৪-এর কংগ্রেসওম্যান ব্রেন্ডা লরেন্স। এ সময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অবদান সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। আমেরিকায় এই প্রথম প্রকাশ্য রাস্তায় বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। টুকরো সিরামিক পাথরের সমন্বয়ে তৈরি ভাস্কর্যটির দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ও প্রস্থ সাড়ে ৫ ফুট। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭ লাখ টাকা। রাতের আঁধারে যাতে ভাস্কর্যটি সবাই দেখতে পান সেজন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ডেট্রয়েট সিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যক্তি মালিকানাধীন ইজারার জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটি।

প্রতিবেদন: মৌরী হোসেন

শুভ জন্মদিন হে মনীষা

সৈয়দ শাহরিয়ার

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। মধুমতী ও ঘাঘোর নদীবিধৌত সবুজ শ্যামল টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম নিলেন আলোকোজ্জ্বল এক নক্ষত্র। নাম তাঁর শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকন্যা তিনি। কেউ কি কখনো ভেবেছিল টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম নেওয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকন্যা শেখ হাসিনাই হবে বাংলাদেশের জনগণের আলোকবর্তিকা। তিনি প্রায়ই বলেন, 'আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই এবং হারাবারও কিছু নেই। আমি মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি, আমি মানুষের কল্যাণ চাই'।
বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন শেখ হাসিনা।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে বিপর্যস্ত বিশ্ব যার প্রভাব এড়াতে পারেনি বাংলাদেশও। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় বাংলাদেশের জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জনগণকে বাঁচাতে বহুমাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শক্ত হাতে সামলে নিয়েছেন তিনি সবকিছু। ফলে বাংলাদেশের জনগণ স্বপ্ন দেখছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। করোনার মধ্যেও থেমে নেই মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ। দেশের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ছে। বাড়ছে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা। অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠায় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ২ হাজার ৬৪ ডলার। আগের অর্থবছরে ছিল ১ হাজার ৯০৯ ডলার। অর্থাৎ মানুষের মাথাপিছু গড় আয় এক বছরের ব্যবধানে ১৫৫ ডলার বেড়েছে। প্রশাসনেও শক্ত হাতে হাল ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানের এই সংকটকালেও বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সফলভাবে সংকট মোকাবিলা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। করোনাকালে গৃহবন্দি মানুষের পাশে দাঁড়াতে প্রধানমন্ত্রী নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের এই সংকটকালে যেসব মধ্যবিত্ত পরিবার মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পাততে পারেনি তাদের তালিকা করে ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি। করোনায় মানুষ যখন দিশেহারা, সেই মাসেই হানা দেয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড় আম্পান। প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিল ঝড়ে বড়ো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হবে, গৃহহীন হবে অনেক মানুষ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে নিশ্চিত হয় উপকূলের লাখো মানুষের নিরাপত্তা। আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করায় বড়ো ধরনের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় মানুষজন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দেওয়াসহ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম এখনো চলমান।

করোনায় লকডাউনের কারণে যখন কৃষি শ্রমিক ঘরে ধান তুলতে পারছিল না, তখন শ্রমিকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নির্দেশ দেন মাঠ প্রশাসনকে শ্রমিকদের কাজে সহায়তার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন যারা প্রধানমন্ত্রীর অনুসারী তারা ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দেয়। ফলে বন্যায় ডুবে যাওয়া ফসল এবং শ্রমিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় কৃষি শ্রমিকরা। করোনা চলাকালে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ১৯টি প্যাকেজে ১ লক্ষ ৩ হাজার ১১৭ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। এতে বড়ো, মাঝারি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ব্যাবসায়ীরা যেমন প্রণোদনা পেয়েছেন তেমনি বাদ যাননি চিকিৎসকরা। তাদের জন্যও ঘোষণা করা হয় স্বাস্থ্য বীমা বা প্রণোদনা। দরিদ্র কৃষক ও কৃষির উৎপাদন বাড়াতে ৫ হাজার কোটি টাকা ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা। এতে অন্তর্ভুক্ত হয় মসজিদের ইমাম, খতিব, মোয়াজ্জিন, মাদ্রাসার শিক্ষক, নন-এমপিও শিক্ষক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গ্রামপুলিশ, প্রতিবন্ধী ও দুস্থ সাংবাদিক। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের কথাও ভুলে যাননি সরকারপ্রধান। তাদেরও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পৌরসভার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরও দেওয়া হয়েছে প্রণোদনা। কোরবানি ঈদের পূর্বে প্রতি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। দরিদ্র পরিবারের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়। দেশে এখন আর খাদ্যঘাটতি নেই। শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে কোনো সংকট সৃষ্টি হয়নি; বরং উৎপাদন বেড়েছে। বর্তমান এই সংকটকালে গণভবন থেকে বার বার তৃণমূল মাঠ প্রশাসনে এবং বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। মানুষের জীবন ও জীবিকা সচল রাখতে দিয়েছেন সব ধরনের নির্দেশনা। স্বাস্থ্য খাতে যেখানেই অব্যবস্থা লক্ষ করেছেন সেখানেই মনিটরিং করেছেন তিনি। এছাড়া এখনো নিয়মিত মন্ত্রিসভার বৈঠকসহ নানা কর্মসূচিতে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

জুনের শেষ সপ্তাহে দেশের কয়েকটি জেলায় আঘাত হানে ভয়াবহ বন্যা। বন্যা ও নদীভাঙন রোধেও নজর দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিদের বন্যার্তদের পাশে এসে দাঁড়াবার ও যারা আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে তাদের পুনর্বাসন করার নির্দেশনা দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে শেখ হাসিনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার সরকার দেশ পরিচালনায় সুশাসন ও দেশের কল্যাণ করেছেন। জন্মদিনের শুভক্ষণে তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিনে শুভ কামনা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে স্বাধীনতার প্রস্তুতি

ড. মোহাম্মদ হাননান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ১৯৭১-২০২০, এখন সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রস্তুতি চলছে। এ স্বাধীনতার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-এর দশকে। এ সময় বাংলাদেশকে পাকিস্তানিরা নাম দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। আর সারা পাকিস্তানেই তখন চলছিল জেনারেল আইয়ুব খানের শাসন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা জেনারেল আইয়ুবকে প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছিল। এ চ্যালেঞ্জ প্রথম সরব হয়ে ওঠে ১৯৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে। এর আগের দিন ৩১শে জানুয়ারি করাচিতে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সামরিক সরকার গ্রেফতার করেছিল। তারই প্রতিবাদে সকল ছাত্র সংগঠনের মিলিত সামরিক শাসনবিরোধী বিক্ষোভ হয় ঢাকায়। ঢাকায় সেদিন জেনারেল আইয়ুব খান পা ফেলেছেন। ছাত্ররা দেয়ালে-দেয়ালে লিখেছিল 'Down Ayub'। মিছিলে মিছিলে শহর কেঁপে উঠল।

এরপর ১৯৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে ছাত্ররা আবার আন্দোলন শুরু করে পাকিস্তানের তথাকথিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনও সমগ্র ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে। তবে ১৯৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে গণবিরোধী শরিফ শিক্ষাকমিশন ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তা ছিল সর্বগ্রাসী। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সামরিক সরকার মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিল ছাত্রসমাজের কাছে। গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ এক মোর্চা জেগে উঠেছিল তাতে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনের পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার জনগণের মুক্তিসনদ ছয় দফা ঘোষণা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ছাত্র-জনতা মিলিতভাবে ১৯৬৯ সালে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসে। তারপরই ১৯৭০ সালে নির্বাচন, নির্বাচনে বাংলার জনগণ নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট দান করে আওয়ামী লীগকে। আর সেখান থেকেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যেভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, তার দশ বছর পরে ১৯৬২ সালের শিক্ষানীতি বাতিলের আন্দোলনের মাধ্যমে তার একটা সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে পটভূমিটি বিশদভাবে জানার জন্য ১৯৬২ সালের শিক্ষানীতি বাতিলের ছাত্র আন্দোলনটি আজকের নতুন প্রজন্মের জানা প্রয়োজন।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাস থেকে ছাত্র আন্দোলনের নতুন দিগন্তের শুরু হয়েছিল। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শরিফ কমিশনের সুপারিশও বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করল। এই অগ্রহণযোগ্যতার কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য শরিফ কমিশন প্রতিবদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানে একটু করা যেতে পারে।

শরিফ কমিশন এবং তার প্রতিবেদন

আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হয়েই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করার চিন্তাভাবনা করেন। এ সম্পর্কে একটি ঘোষণা ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৫৮) সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। আইয়ুব খান নিজেই ৫ই জানুয়ারি (১৯৫৯) কমিশনের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষাবিভাগের সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুবের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব এস.এম. শরিফকে চেয়ারম্যান করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়।

১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে এই কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রেসিডেন্টের কাছে দাখিল করা হয় এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বলা হয়েছিল:

> আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেইজন্য ষষ্ঠ শ্রেণি হইতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হইবে। [শরিফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৩৪৯]
>
> এবং 'উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে'। অন্যত্র, 'উর্দু ও বাঙলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে'। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৫১৯]

শরিফ কমিশন পাকিস্তানের একটি অভিন্ন বর্ণমালার জন্যও সুপারিশ করে। স্মর্তব্য যে, এর মাত্র সাত বছর আগে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলায় সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। জাতীয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে পূর্ববাংলা তখনো সরগরম। শরিফ কমিশন অত্যন্ত সুকৌশলে বিতর্ক টেনে বলে যে:

> পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় (নাস্‌খ্‌) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। [কমিশন প্রতিবেদন পৃষ্ঠা-৩৭০]

লক্ষ্যযোগ্য বিষয় যে, তৎকালে বাংলার উপর উর্দু চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে আরবীকে বাংলার বিকল্প হিসেবে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু শরিফ কমিশন শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের অবসানকল্পে সিদ্ধান্ত টানে অন্যরকম, যা মাতৃভাষা বাংলার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজের কাছে আরেকটি ষড়যন্ত্র হিসেবেই আবিষ্কৃত হয়:

> আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাঙলা

বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালায় এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানী ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা -৩৭৩]

কমিশন আরো সুপারিশ করে যে:

বিকল্পভাবে সরকারের পক্ষে তিনটি ভাষাবিদ কমিটি নিয়োগ করা উচিত যাহাদের একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নয়নকৃত মুদ্রণযোগ্য একটি উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ করিবে, দ্বিতীয়টি বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার করিবে এবং তৃতীয়টি উর্দু ও বাঙলার জন্য একটি রোমান বর্ণমালা গঠন ও মান নির্ধারণ করিবে। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা-৩৭৩]

শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শরিফ কমিশন অর্থসংস্থান সম্পর্কিত যে সুপারিশ ও মন্তব্য করে তা-ই সম্ভবত ছিল এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এখানে শিক্ষাকে একটি 'বিনিয়োগ' তথা লাভ-লোকসানের ব্যাবসা হিসেবে দেখানো হয়। শরিফ কমিশন তার প্রতিবেদনে সরাসরি এই বাক্যটিই লিপিবদ্ধ করে:

'শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়'। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা-৩৯৬]

কমিশন অত্যন্ত খেদের সঙ্গে আবিষ্কার করে:

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণের রীতি ছিল শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসেবে না দেখিয়ে একটি ব্যয়বহুল সমাজসেবামূলক কাজ হিসেবে দেখা। [পৃষ্ঠা ৩৯৫]

সুতরাং তারা নতুন তত্ত্ব হাজির করে যে, শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের মূলধন বিনিয়োগ, অর্থনীতির সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে:

শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে (investment– লেখক) আমরা যে -নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষাবাবদ অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়। [পৃষ্ঠা ৩৯৫]

শরিফ কমিশনে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা' বলে পরিহাস করা হয় এবং সর্বজনীন শিক্ষার গণদাবিকে নির্বিচারে ব্যঙ্গ করে বলা হয়:

শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতটা দাবি জানাইয়া থাকে ইহার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাহাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৩৯২] ।

শরিফ কমিশনের আরেকটি সুপারিশ এখানে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, নিম্নোক্ত এই বিষয়টিও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে সাধারণ ছাত্রদের চেতনাকেও নাড়া দিয়েছিল:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা অতীব জোরের সহিত সুপারিশ করিতেছি যে, স্নাতক (Graduate) ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বছর মেয়াদী করা উচিত হইবে। [কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ২৪]

ছাত্রসমাজের মূল্যায়নে শরিফ কমিশন প্রতিবেদনকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি হিসেবে চিহ্নিত করে। শিক্ষা সংকোচন নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে 'শিক্ষা বিনিয়োগ' শব্দ দ্বারা মূলত যে-সন্তানের পিতার টাকা আছে তার জন্যেই শিক্ষার দ্বার খোলা রাখার প্রস্তাব করা হয়। এতে দরিদ্র পিতার সন্তান মেধাবী হলেও শিক্ষার দ্বার তার জন্যে বিলাসিতা হিসেবেই গণ্য হয়।

শরিফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন

খুব স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররা এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে। এমনিতেই সেই সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ইস্যু পেলেই আইয়ুব খান তথা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছিল। এমন একটা অবস্থায় শরিফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ ছিল 'ভীমরুলের চাকে খোঁচা' দেওয়ার মতো। ছাত্ররা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং শুধুমাত্র শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই এত বিশাল ও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে আর হয়নি। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্ররা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। তবে এই আন্দোলন চলছিল অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে (অন্তত আগস্ট মাস পর্যন্ত)। অবশ্য এই সময় সারা দেশের মেডিক্যাল স্কুল ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররাও তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আন্দোলন, এমনকি অনশন ধর্মঘটের পর্যন্ত আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। [*দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২]

তিনবছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্সের ব্যাপারে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সর্ব প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ডিগ্রি ছাত্র জনৈক এম.আই. চৌধুরী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এর পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পরীক্ষার্থীরাও আন্দোলন শুরু করে। তাদের ব্যাপার ছিল উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ইংরেজির অতিরিক্ত বোঝা। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কলেজে এই আন্দোলন চলছিল। স্নাতক

শ্রেণির ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রদের ইংরেজির ক্লাস বর্জনের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। জুলাই ভরে এভাবেই আন্দোলন চলে। 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে সংগঠন পরে 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। জগন্নাথ কলেজ, কায়দে আযম কলেজ (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এবং ইডেন কলেজে এদের মূলশক্তি নিয়োজিত ছিল।

তবে আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে ১৯৬২ সালের ১০ই আগস্টে। এদিন বিকেলে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় শ্রেণির ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ। তিনি তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের এ কথা বোঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। এই সভার পূর্বপর্যন্ত ছাত্র-সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনের কোনো যোগসূত্র ছিল না।

১০ই আগস্টের এই সভায় ১৫ই আগস্ট সারা দেশে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং দেশব্যাপী সকল ছাত্রসমাজের কাছে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে ১০ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বরের সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজের ব্যাপক ছাত্রছাত্রী এতে প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করে। ১০ই সেপ্টেম্বরের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়। এতে যোগদান করেন ডাকসুর পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার বাসু, ঢাকা কলেজ ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক, জগন্নাথ কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, কায়দে আযম কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজ (নারায়ণগঞ্জ) সংসদের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ বাগমার প্রমুখ।

কাজী ফারুক আহমদ ও আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরামের। শুধুমাত্র তিনবছর ডিগ্রি কোর্স বাতিলের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি একটা ব্যাপক আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে একে দাঁড় করানো হবে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এতদিন ছিল স্কুল ও কলেজগুলো, এখন তা চলে এল বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায়। ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম থেকে ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম হয়ে সংগঠন রূপ নিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে।

১৫ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বিরাট ছাত্র-সমাবেশের পরে প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে চলছিল অবিরাম ধর্মঘট। নয়-দশ বছরের স্কুল বালক-বালিকারাও আস্তে আস্তে মিছিলে শামিল হতে থাকে। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা একটা নিত্যদিনের দৃশ্য হয়ে দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ১০ই সেপ্টেম্বরের সচিবালয়ে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এদিন এক প্রেসনোটে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। অন্যথায় পরিস্থিতি মারাত্মক হবে বলে হুমকি প্রদান করে।

১০ই সেপ্টেম্বরের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হলেও ছাত্ররা ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয় এবং এর পক্ষে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে থাকে। পথসভা, খণ্ডমিছিলসহ ব্যবসায়ী সমিতি, কর্মচারী সমিতি, রিকশা ইউনিয়ন, শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এর মধ্যে ১০ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেয়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আসেন। হরতালের পূর্বদিন তাঁর ঢাকা আগমনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে নিয়ে শহরে ফেরার পথে হরতালের পক্ষে স্লোগান দেওয়া হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং শুরু করে। পিকেটিং-এর আওতায় পড়ে কার্জন হলের সামনে মোনায়েম মন্ত্রিসভার সদস্য হাসান আসকারির মার্সিডিজ গাড়ি ভস্মীভূত হয়। একইসঙ্গে জ্বলতে থাকে দু-তিনটি পুলিশের জিপও। রাস্তায় বিক্ষোভকারী মানুষে টইটম্বুর হয়ে যায়। সার্জেন্ট হাফিজের নেতৃত্বে একদল পুলিশ নবাবপুর রেলক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে ধাওয়া ও গ্রেফতার করে চলছিল। সকাল ৯টা না বাজতেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে-লোকারণ্য হয়ে যায়। শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটা বড়ো সমস্যা হয়ে ওঠে। সভা করার কোনো পরিবেশ ছিল না। এমন সময় খবর আসে নবাবপুরে গুলি হয়েছে এবং কয়েকজন তাতে শহিদও হয়েছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত জমায়েতে এক অগ্নিশিখার ঢেউ বয়ে যায়। মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল ১০টায়। কিন্তু এই সময়েই মিছিল বের করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এরপর বের হয় জঙ্গি মিছিল। এতে নেতৃত্ব দেন সিরাজুল আলম খান, মফিজুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী প্রমুখ। মিছিল যখন হাইকোর্ট পার হয়ে আবদুল গনি রোডে প্রবেশ করছিল তখন মিছিলের পেছনে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। নিহত হয় বাবুল এবং গোলাম মোস্তফা (ই.পি.আর.টি.সি সরকারি বাসের মেহনতি কন্ডাকটর)। একইসঙ্গে আহত হয় ওয়াজিউল্লাহ (গৃহভৃত্য)। সে হাসপাতালে পরের দিন ইন্তেকাল করে। আহত হয় এছাড়া অনেকে।

এসব ঘটনা বিক্ষোভকারীদের আরো জঙ্গি করে তোলে এবং মিছিল এগিয়ে যেতে থাকে। রথখোলার সামনে মিছিল পৌঁছালে দেখা যায় কয়েক হাজার পুলিশ ঐ মিছিলের ওপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। ব্যারিকেডের অপর পাশে জগন্নাথ কলেজের দিক থেকে আসা অপর একটি বিরাটকায় মিছিল। দুটি মিছিল যাতে মিলতে না পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা। ব্যারিকেড ভাঙার জন্য একপর্যায়ে চলে ছাত্রদের ইষ্টক-বৃষ্টি। সামান্য হটে যেতে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। পরে এলোপাতাড়ি গুলি ও টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে বিক্ষোভকারীরা হটে যেতে বাধ্য হয়। আহত হয় অসংখ্য। প্রায় ২৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে মেহনতি মানুষের অংশগ্রহণ ছিল শতকরা ৯৫ জন। দেখা গেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে এ পর্যন্ত

নৌকার মাঝিরা বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে চলে এসেছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি অবলোকন করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের মধ্যবর্তী রেলিং টপকিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে আসেন। সেখানে ছিল এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। আহত আর নিহতদের রক্তে সমস্ত মেঝে ভেসে যাচ্ছিল। শহিদদের আত্মীয়স্বজনরা দাফনের জন্য লাশ নিতে চাইলে সেনাবাহিনী বাধা দেয় এবং লাশ গায়েব করার চেষ্টা করতে থাকলে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতার বাধা পায়। লাশ মর্গ থেকে সরিয়ে ছাত্ররা পাহারার ব্যবস্থা করে।

যশোরের এদিন কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৪৩ জন আহত হয়। এরমধ্যে ৪১ জনই ছিল পুলিশ। চট্টগ্রামে অবনতিকর পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। প্রায় ২৭ জন ছাত্রসহ মোট ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। [*পাকিস্তান অবজারভার*, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২]

দশজন রাজনৈতিক নেতা ১৭ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেন। তাঁরা ঘটনার জন্যে পুলিশের উসকানিকে দায়ী করে প্রশ্ন করেন:

> ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করারই কথা ছিল। কিন্তু কেন অতি ভোরেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও কলেজে উসকানিমূলকভাবে টিয়ার গ্যাস ছাড়তে গিয়েছিল। অবিলম্বে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি করা হোক এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দিন। [*পাকিস্তান অবজারভার*, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২]

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী, মোহসেনউদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক মিয়া (নান্না মিয়া) এবং শাহ আজিজুর রহমান।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সারা প্রদেশে ৩ দিনব্যাপী শোকের প্রস্তুতিতে পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় সলিমুল্লাহ হলে আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন বেলুচিস্তানের প্রগতিশীল নেতা খায়ের বক্স মারী এবং গাউস বক্স বেজেঞ্জো। মোনাজাতের পর দুজন দুজন করে পাঁচ হাতের ব্যবধানে লাইন করে এক বিরাট শোকমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ বা ই. পি. আর মিছিলে বাধা প্রদান করেনি।

২৩শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সরকারহাটের স্কুলের ছাত্ররা একই কর্মসূচি নিয়ে যখন ধর্মঘট ও মিছিল করে, তখন পুলিশের গুলিতে একজন স্কুলছাত্র নিহত হয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে সব সংগঠনের এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবিলম্বে দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে 'চরমপত্র' দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আপাতত আন্দোলনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রশক্তি নেতা মীজানুর রহমান শেলী এ লেখককে জানিয়েছেন:

> পল্টন ময়দানে ছাত্রদের উদ্যোগে এটাই ছিল প্রথম জনসভা। ছাত্ররা এর নাম দিয়েছিল 'ছাত্রজনসভা'। এর আগে পল্টনে ছাত্রদের বিশাল আকারের কোনো সভা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। সেদিন সভায় বক্তৃতা করেছিলেন ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, ছাত্র ইউনিয়নের কাজী জাফর আহমদ, এন.এস.এফ-এর আবুল হাসনাত এবং ছাত্রশক্তির মীজানুর রহমান শেলী। [সাক্ষাৎকার সাবেক তথ্যমন্ত্রী ড. মীজানুর রহমান শেলী]
>
> শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শে ছাত্র-অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনের মধ্যে সরকার শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। একইসঙ্গে এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালের জন্যে যে-সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষায় ফরম পূর্ণ করেছিল, পরীক্ষা না নিয়েই তাদের সকলকে পাস করিয়ে দিয়ে ডিগ্রি প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়।

এভাবে আংশিক বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলন ছাত্রসমাজ ও ছাত্র-সংগঠনসমূহের জন্য অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেয়। শুধু শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যাপক ও বিশাল ছাত্র-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে তা ছিল ছাত্র-নেতৃবৃন্দের জন্যে একটি বিরাট শিক্ষা।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এ দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজের জন্ম দেয়। আর ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনে এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সঙ্গে প্রগতিশীলতার স্ফুরণ ঘটায়। সমগ্র দেশে ১৯৬২-এর আন্দোলন তাই অসামান্যস্পর্শী প্রাণের জোয়ার বয়ে আনে। যদিও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবের জন্যে এই আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি অতিক্রম করে কৃষক ও শ্রমিকের মৈত্রী জোট গঠনে সক্ষম হয়নি, তথাপি তা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের জন্যে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার সূচনা করে।

এই সময়টা এভাবেই শিক্ষা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের বৃহত্তর আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক পড়াশুনায়রত ছাত্ররা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলন তবু চালিয়ে যাচ্ছিল। ঢাকা পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট, তেজগাঁও কৃষি কলেজ এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। আন্দোলনের তোড় অত্যন্ত জোরে প্রবাহিত হলে সরকার এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করে। সব মিলিয়ে ১৯৬২ সালে মাত্র ২৭ দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস হয়।

১৯৬২ সালে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এই যে আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা-ই বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। তখন ছাত্রসমাজের মধ্যে বাংলার স্বায়ত্তশাসন ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে। এই স্বায়ত্তশাসন ভাবনা থেকে স্বাধীনতার চেতনা স্ফুরিত হয়ে ওঠে, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সফলতা পায়।

বাংলাদেশের এ স্বাধীনতার এখন সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন শুরু হয়ে গেছে। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন এ স্বাধীনতাকে সহজ করে তুলেছিল, বর্তমান প্রজন্ম ইতিহাসের এ সত্য থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।

লেখক: বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসের ১৩ খণ্ড গ্রন্থের লেখক ও গবেষক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ নিউইয়র্ক জাতিসংঘের সদরদপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন

বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বে শীর্ষবিন্দু স্পর্শী শেখ হাসিনা

মিলন সব্যসাচী

বিশ্বনন্দিত নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিশ্বের নারী নেতৃত্বাধীন সরকারপ্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন দেশ পরিচালনার ঐতিহাসিক রেকর্ড করেছেন। ১৯৯৬, ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বর্তমান মেয়াদের পূর্ণ সময় সমাপ্ত হলে তাঁর সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা হবে ২০ বছর। আন্তর্জাতিক সংস্থা উইকিলিকসের গভীর গবেষণা থেকে জানা যায়, নারী সরকারপ্রধান হিসেবে বহু বছর দেশ পরিচালনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেট ও প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রিকা কুমারা তুঙ্গার মতো নেত্রীদের পেছনের সারিতে রেখে উল্কার মতো গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উইকিলিকসের জরিপে বলা হয়েছে– 'শেখ হাসিনা এখন নারীদের পুনর্জাগরণের প্রতীক।' বিশ্বে পরিচিতি ও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার বিষয়কে গুরুত্বারোপ করে এ তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ জরিপ অনুসারে সেইন্ট লুসিয়ার গর্ভনর জেনারেল ডেম পিয়ারলেত্তে লুজি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা নারী রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি ১৯৯৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ২০ বছর ১০৫ দিন দেশ পরিচালনা করলেও বিশ্ব রাজনীতিতে শেখ হাসিনার মতো বহির্বিশ্বে তার ততটা পরিচিতি নেই। দেশে-বিদেশের অনেক প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যদি শারীরিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ থাকেন, তাহলে ডেম পিয়ারলেত্তে লুজির রেকর্ডও তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। শেখ হাসিনার বিকল্প কিংবা যোগ্য উত্তরসূরি এখনো কেউ হয়ে উঠেনি। তাঁর অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে তাই দেখা যায়।

বিশ্বের নারী নেতৃত্বে সফলতার ক্রমবিকাশে আরেকটি নাম ভিগডিস ফিনবোগাদোত্তির। ১৯৮০ সালের ১লা আগস্ট থেকে একটানা ১৬ বছর আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনিও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শেখ হাসিনার মতো এতটা সুপরিচিত নন। এছাড়াও ১৪ বছর ৩২৮ দিন রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডেম উজেনিন দেশ পরিচালনা করেছেন। আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ম্যারি ম্যাকিলিস ১৩ বছর ৩৬৪ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলতা ও সক্ষমতাও প্রশংসনীয়। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। বর্তমান বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতাবান নারী নেতৃত্বের অন্যতম। ২০০৫ সালের ২২শে নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে এখনো জার্মানের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ বছর। ম্যার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাজ্যের সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষতায় ছিলেন ১১ বছর ২০৮ দিন। চন্দ্রিকা কুমারা তুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দু'বারেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১১ বছর ৭ দিন।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন শেখ হাসিনা। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে ২০০৯ সালে আবার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ২০১৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শেখ হাসিনা তখনো প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবার শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। চতুর্থ মেয়াদের ১ বছর পার করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন বিশ্বনন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা। ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট থ্যাচার, অ্যাঞ্জেলা মার্কেল ও শেখ হাসিনা–মাত্র চারজন নারী নেত্রী সার্বিক সফলতার শিখরে আরোহণ করেছেন। এরা সবাই স্বদেশকে সম্ভাবনার স্বর্ণালি দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। চতুর্থবার ক্ষমতায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই মার্চ ২০২০ গণভবন থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অভিন্ন কৌশল গ্রহণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন– পিআইডি

আরোহণের পর বিশ্ব স্বীকৃত ও সুপরিচিত অন্যান্য নারী নেতাদের ঐতিহাসিক কীর্তি কর্মের সর্বোচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করেছেন বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বের শীর্ষবিন্দু স্পর্শী শেখ হাসিনা। তাঁর মেয়াদে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাপক সফলতার সাক্ষর রেখেছে। বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ তাঁর শাসন আমলেই সার্বিক উন্নয়নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে।

২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ইউনেস্কোর 'Memory of the World International Register'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের মতো বিশ্ব সংস্থার এ সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা এ স্বীকৃতির অন্তরালে সার্বিক প্রেরণা জুগিয়েছে। যে প্রচেষ্টায় মহাকালের মহানায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববাসীর কাছে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়িত হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। শেখ হাসিনার যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাধনায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, যা আমাদের আরেকটি যুগান্তকারী অর্জন। ২০১৫ সালের সূচনা পর্ব থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিন বছর গভীর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শেষে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়ক দিয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছে এরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত এই অর্জন । বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। শেখ হাসিনার শাসন আমলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) সর্বোত্তমভাবে অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের বিস্ময়। বিশ্ববাসীর শেকড় সন্ধানী দৃষ্টিতে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

এছাড়াও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইনক্লুসিভ ইকোনমিক ইনডেক্স অনুযায়ী অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালের ২৯শে আগস্ট 'দ্য স্পেক্টেটর ইনডেক্স'-এ প্রকাশিত বিশ্বের ২৬টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে শীর্ষ জিডিপি অর্জনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে বিশ্বের সেরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আস্থা ক্রমশ বাড়ছে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসকে সম্মান জানানোর জন্য ওয়াশিংটন ডিসি'র মেয়র মুরিয়েল বাওসার ২৬শে মার্চকে 'বাংলাদেশ দিবস' ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেরিত একটি চিঠিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ব্যাপক প্রশংসা করে বলা হয়েছে– বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সহনশীল, বন্ধুত্ববাদী এবং মধ্যপন্থি জাতির দেশ।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানসহ শান্তি ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে অনেক সম্মানসূচক ডিগ্রি ও পুরস্কার প্রদান করেছে। এসব পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দিয়েছে এবং তিনি বিশ্বনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

চলে গেলেন সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম সি আর দত্ত

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার চিত্তরঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত) চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৫শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

সি আর দত্তের জন্ম ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারি। তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আর্মিতে অফিসার পদে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদ থেকে অবসরে যান। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য স্বাধীনতার পর তাঁকে 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

সি আর দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শোকবার্তায় বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অনন্য অবদান দেশ ও জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে।

প্রতিবেদন : মৌমিতা হক

কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর
VOICE OF MILLIONS

নাসরীন মুস্তাফা

প্রচ্ছদে চিরচেনা দৃপ্ত সেই প্রিয় মুখ। পেছনের প্রচ্ছদে পাশ থেকে দেখা সেই মুখের টান টোন। হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' হিসেবে কেবল বাংলাদেশের নন, বিশ্বজুড়ে শোষিত মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জোগানোর কারিগর হয়ে নিজেই হয়ে উঠেছেন 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার নাম সঙ্গত কারণেই রাখা হয়েছে *কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর*, যার ইংরেজি নাম *Voice of Millions*। একই মলাটের ভিতরে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রকাশিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় অঙ্গসজ্জায় স্মরণিকাটির প্রকাশকাল ১৭ই মার্চ ২০২০, ৩রা চৈত্র ১৪২৬।

কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর প্রকাশে প্রধান সম্পাদনা উপদেষ্টা হিসেবে সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'-এর সভাপতি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। সম্পাদনা উপদেষ্টা ছিলেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'-এর সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদা-কালো ছবির নিচে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা সেই বিখ্যাত কবিতার বিখ্যাত চারটি লাইন–

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

হৃদয়গ্রাহী সূচিতে প্রথমেই আছে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার কবিতা 'বাবা'। চোখ ভিজে আসে পড়তে পড়তে, মনে হতে থাকে– এভাবে লিখতে পারেন পিতাহীন সন্তানই কেবল। বাবা বঙ্গবন্ধু যখন বেঁচেছিলেন, তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে লিখেছেন–

জন্মদিনে প্রতিবার একটি ফুল দিয়ে
শুভেচ্ছা জানানো ছিল
আমার সবচেয়ে আনন্দ।

শেখ রেহানা আর কখনো পাবেন না এমন সুখ, আর কখনো বাবাকে বলতে পারবেন না 'শুভ জন্মদিন'। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে দুই কন্যা ছাড়া বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হয়েছিলেন। কবিতার কোথাও সেই কালরাতের উল্লেখ নেই, তবে বাবাকে সন্ধ্যাতারাদের মাঝে, বিশাল সমুদ্রের ঢেউদের খেলার মাঝে, পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে মেঘ নীল আকাশে লুকোচুরি খেলে, আকাশে-বাতাসে পাহাড়ে উপত্যকায় খুঁজতে থাকা সন্তানের আকুতির মধ্য দিয়ে তীব্র হয়ে ওঠে অসীম হাহাকার।

স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়বে, সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা জানিয়েছেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে বাংলাদেশকে

কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর
Voice of Millions

প্রধান সম্পাদনা উপদেষ্টা: শেখ হাসিনা
সম্পাদনা উপদেষ্টা: জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক: ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
প্রচ্ছদ: সেলিম আহমেদ
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত পোর্ট্রেট: সব্যসাচী হাজরা
লে-আউট ডিজাইন ও অক্ষরবিন্যাস: পাঠক সমাবেশ ডিজাইন স্টুডিও
মুদ্রণ ও বাঁধাই: কালচার প্রেস, ঢাকা
প্রকাশকাল: ১৭ই মার্চ ২০২০, ৩রা চৈত্র ১৪২৬

বিশ্বসভায় আরো উচ্চ আসনে নিয়ে যাবার জন্য সকলকে দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্মরণিকাটির 'মুখবন্ধ' যৌথভাবে লিখেছেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন প্রসঙ্গে তাঁরা লিখেছেন– 'এ আয়োজনের তাৎপর্য হবে সুদূরপ্রসারী। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়াই হবে আমাদের প্রত্যয়।'

স্মরণিকাতে এরপর যুক্ত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রতিটি পাতায় প্রথমে সাল ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ক্যাপশনসহ প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে।

বেদনাবিধুর হয়ে ওঠা পাঠকের মনকে নাড়িয়ে দেয় এর পরের অংশটি। স্মৃতিকথা/নিবন্ধ বিভাগে প্রথমেই আছে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার লেখা স্মৃতিকথা 'ভাইয়েরা আমার'। ভাইয়েরা আমার দিয়ে শুরু করা বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঐতিহাসিক সেই ৭ই মার্চের ভাষণের দিনটির কথা বলা হয়েছে এখানে। সেই দিনটিতে জনমানুষের উত্তেজনা, সবাইকে কী বার্তা দেবেন তা নিয়ে চিন্তিত বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ের মতো পরামর্শ দিলেন বঙ্গমাতা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন–

> আব্বাকে মা ঘরে যেতে বললেন। পাশের ঘরটা শোয়ার ঘর। আমি আর আব্বা ঘরে গেলে মা বললেন, "তুমি একটু বিশ্রাম নাও।" আব্বা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে আব্বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। এটা আমার সব সময়ের অভ্যাস। মা একটা মোড়া টেনে বসলেন। হাতে

পানের বাটা। পান বানিয়ে আব্বার হাতে দিলেন। তারপর তিনি বললেন, "দেখো, তুমি সারাটা জীবন এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ, দেশের মানুষের জন্য কী করতে হবে তা সকলের চেয়ে তুমিই ভালো জানো। আজকে যে মানুষ এসেছে, তারা তোমার কথাই শুনতে এসেছে। তোমার কারও কথা শোনার প্রয়োজন নেই, তোমার মনে যে কথা আছে তুমি সেই কথাই বলবে। আর সেই কথাই সঠিক কথা হবে। অন্য কারও কথায় তুমি কান দেবে না।"

...রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছে তিনি দৃপ্ত পায়ে মঞ্চে উঠলেন। একনজর তাকালেন উত্তাল জনসমুদ্রের দিকে। তারপর বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠলেন: "ভাইয়েরা আমার..."

শেখ হাসিনা সুলেখক হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর কারণে। এই স্মৃতিকথাটিও অনবদ্য।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের স্বজন হিসেবে খ্যাত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিরলস এক রাষ্ট্রনায়ক' যুক্ত হয়েছে এরপর। বঙ্গবন্ধুর জন্ম থেকে শুরু হয়েছে তাঁর লেখনী। কীভাবে বঙ্গবন্ধু 'নিরলস রাষ্ট্রনায়ক' হয়ে উঠলেন, তা জানা যায় এ লেখায়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি মুজিবের বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার বর্ণনা পাঠক বুঝতে পারবেন। বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহস প্রণব মুখোপাধ্যায়কেও মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন–

১৯৭৩ সালের বঙ্গবন্ধুর একটি মন্তব্য দিয়ে আমার লেখাটির ইতি টানব। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় তাঁর নিজের হাতে লেখা এই মন্তব্য থেকে। "একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা-কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার স্মৃতিকথা 'আমার বাবা শেখ মুজিব' এই স্মরণিকার সবচেয়ে উপভোগ্য লেখাগুলোর একটি। সরল ভাষায় তিনি তাঁর চোখ দিয়ে পাঠককে দেখিয়েছেন ৩২ নম্বর ধানমন্ডির দোতলা বাড়ির মধ্যমণি সেই বাবাকে, যাঁর সন্তানরা তাঁকে ঘিরে কবুতরের মতো কলকল করে উঠত। তিনি চিনিয়েছেন বঙ্গমাতার চিরচেনা বাঙালি মায়ের রূপকে, যিনি কিশোরী কন্যা মিছিলে গেছে বলে হাতপাখার ডাঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন শাসনের জন্য! আমি ব্যক্তিগতভাবে শহিদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের একটি স্পষ্ট ছবি পেয়েছি এই লেখায়, যা আগে কখনো কোথাও দেখিনি। ভেবে দেখুন দৃশ্যটা। বড়ো ছেলে শেখ কামালের বিয়ে হয়েছে, তিনি বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছেন। ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের আমেজ, ঘর ভর্তি আত্মীয়স্বজন বসা। শেখ জামালের উদ্ধৃতি লেখক লিখেছেন এভাবে–

এই সময় জামাল ভাই বলছেন, "কামাল ভাই তো এখনও স্টুডেন্ট। তিনি কি বউকে খাওয়াতে পারবেন? আমি একটা এস্টাবলিশড ছেলে। তোমরা কেউ আমার বিয়ের কথা বলছ না কেন?"

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু ও একাত্তরের অগ্নিঝরা মার্চ' প্রবন্ধ। একাত্তরের মার্চ মাস আসলেই ছিল অগ্নিঝরা। দিনলিপির মতো করে তারিখের ক্রমানুযায়ী ঘটনাগুলোর বর্ণনা এসেছে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত) এবং এরপর ২৭শে মার্চ দিল্লিস্থ *Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটির উদ্ধৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে লেখাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণায় সাহায্য করবার মতো লেখা এটি।

'মননে স্মরণে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে স্মৃতিকথা লিখেছেন জুলিয়ান ফ্রান্সিস। তিনি ব্রিটিশ এনজিও অক্সফামের সাবেক কর্মকর্তা হিসেবে ভারতের বিহারে একটি কৃষি প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ৬ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীদের জন্য শরণার্থী শিবিরে অক্সফামের ত্রাণ প্রকল্পে কাজ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দীন আহমদের সাহায্যে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয় লেখকের। লেখকের কাছে স্মরণীয় সেই সাক্ষাৎটি ছিল আজীবন মনে রাখার মতন এক অভিজ্ঞতা।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু: চিরন্তন আলোকশিখা' শীর্ষক প্রবন্ধটি। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত কবি তিনি। কামাল চৌধুরী নামে কবিতা লেখেন। তাঁর গদ্যের কাব্যময়তা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, আর এই নিবন্ধটি কাব্যিক গদ্যের চমৎকার উদাহরণ হতে পারে। খানিকটা উদ্ধৃতি দেই তাঁর লেখা থেকে–

বঙ্গবন্ধু বেঁচেছিলেন পঞ্চান্ন বছর। কিন্তু ৫১ বছর বয়সেই তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে একটি সুস্থিত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। আরাধ্য সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি, চেয়েছিলেন শোষিত মানুষের মুক্তি। চেয়েছিলেন কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও প্রতিবিপ্লবীদের অপতৎপরতা সত্ত্বেও আর্থসামাজিক সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তাঁর শাসনামলে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের হাতে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। থেমে যায় সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের জীবনাচরণে, প্রাত্যহিকতায় চিরকালীন বাতিঘরের মতো সমুজ্জ্বল তিনি। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রতি মুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন নতুন প্রেরণা হিসেবে। আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সেখানে তিনিই প্রেরণার আলোকশিখা।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন' শিরোনামে একটি চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী তথ্যবহুল নিবন্ধ লিখেছেন সুলেখক সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শনকে তাঁর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লেখক 'গণতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র', 'জাতীয়তাবাদ' ও 'কূটনীতি' বিভাগে আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন–যা বঙ্গবন্ধুকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণীয় বাণী, তাঁকে নিয়ে বিশিষ্টজনের স্মরণীয় উক্তিসমূহের চমৎকার সাজানো আয়োজনে। ছয় দফা, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর লিখিত গ্রন্থসমূহের পরিচিতির পর ১০ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আয়োজিত মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচন করার চমৎকার একটি ছবি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা দেওয়া হয়েছে স্মরণিকার শেষ অংশে।

এই ঐতিহাসিক মূল্যবান স্মরণিকাটি বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে অনলাইনে। https://mujib100.gov.bd/ ওয়েবসাইট থেকে এটি পড়া যায়, যা নতুন প্রজন্মের জন্য উপযোগী। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহের মাধ্যমে বিদেশে বিতরণ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

লেখক: সাহিত্যিক

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ভালোবাসা

লিলি হক

মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা বাংলাদেশের আজকের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যিনি স্বজন হারানো শোককে শক্তিতে পরিণত করে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন নিরন্তর। যিনি বাংলাদেশের জন্য নিরলস পরিশ্রম করছেন, যিনি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত। সর্বোপরি শেকড়ে যাঁর আজন্ম দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর ইচ্ছেটা প্রোথিত, সেই স্বপ্ন পূরণে সোনার বাংলা গড়ে তোলায় ব্রত। পিতার মতোই যিনি দেশের জনগণকে ভালোবেসে সাফল্যের শিখরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ব্রত নিয়ে নিজের আরাম-বিশ্রামকে বিসর্জন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে আকাশ সমান সফলতার উচ্চতায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারী উন্নয়ন, নারীকে বিকশিত নারী হিসেবে স্বাবলম্বী করে গড়ার লক্ষ্যে, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ যথাযথ নারীবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করায় নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাই এ মাহেন্দ্রক্ষণে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে তিনিই একমাত্র সাহসী নারী, যিনি সবচেয়ে বেশি সময় সর্বোচ্চ নির্বাহী পদে থেকে দেশ পরিচালনা করছেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে বলতে চাই– বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের নারীবান্ধব কার্যক্রমের জন্য এখন নারীরা মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বেগম রোকেয়ার মানসকন্যারা আজ রাজনীতি, সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ পর্যায়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে দেশের প্রতি অবদান রাখছেন। নারী স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। কেউ স্থপতি, কেউ গবেষক, কেউবা চিত্রশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। সর্বোপরি অবাধ

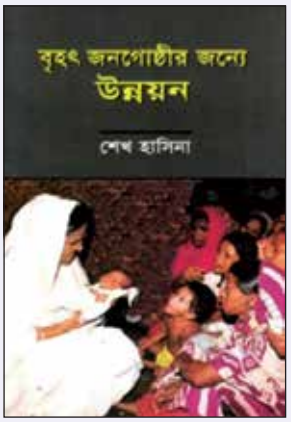

স্বাধীনতায় কর্মক্ষেত্র বেছে নিচ্ছেন। এসব সম্ভব হয়েছে বাবা-মায়ের আদরের হাচু, শেখ কামালের হাসুবু, শেখ রাসেলের চোখের মণি হাসু আপা, আমাদের স্বজন, প্রিয়জন, আপনজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতা, সদিচ্ছা ও আনুকূল্যে।

রাষ্ট্রীয় কাজে ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও তিনি লিখছেন নিরন্তর। কখনো স্বজন হারানোর স্মৃতিচারণ, কখনো দেশমাতৃকার উন্নয়নে নিরীক্ষা ও নির্দেশনামূলক রচনা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হলো– *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, সবুজ মাঠ পেরিয়ে, ওরা টোকাই কেন, বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা, সহে না মানবতার অবমাননা, সাদা কালো, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্যে উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা*, *PEPOLE AND DEMOCRACY, THE QUEST FOR VISION-2021* ইত্যাদি।

মুক্তিকামী পিতা বঙ্গবন্ধুর মতোই তাঁর বীরোচিত জীবন, যে জীবনকে নিয়ে লেখা হয়েছে কবিতা, নিবন্ধ, গান।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা জন্ম নিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কোনো এক শুভক্ষণে। বঙ্গবন্ধুর পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যশিক্ষার হাতেখড়ি হয় তাঁর। ১৯৫৪ সালে পরিবারের সঙ্গে মোগলটুলি রজনীবোস লেনের বাড়িতে বসবাস করা শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে টিকাটুলি নারী শিক্ষামন্দিরে এই মহীয়সী নারী ভর্তি হন। তারপর আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, তৎকালীন গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। জননন্দিত, সত্য, সুন্দর, শান্তির প্রতীক অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান জীবনযুদ্ধে জয়ী এই মানুষটি বিশ্বায়নের অগ্রযাত্রায় অসংখ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, অর্জন করেছেন সম্মান ও মানুষের ভালোবাসা। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে– মাদার তেরেসা পুরস্কার, এম কে গান্ধী পুরস্কার, টেগর পিস অ্যাওয়ার্ড, ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড, ইউনেস্কো শান্তিবৃক্ষ পুরস্কার, ইউএন পরিবেশ পুরস্কার (চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ), সাউথ সাউথ পুরস্কার, গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড, আইপিএস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ডিসটিংশন অ্যাওয়ার্ড ফর লিডারশিপ, লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার প্রভৃতি।

যতদিন প্রকৃতির রং থাকবে সবুজ, গোধূলির লাল রাঙিয়ে দেবে পশ্চিম আকাশ, রজনীগন্ধা বিলাবে সুবাস– ততদিন থাকবে আপনার কর্মসাধনার সফল প্রয়াস। শুভ জন্মদিনে জানাই আকুল প্রাণের বকুল ভালোবাসা। তাঁর সফল জীবনের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। প্রাজ্ঞজনের পোর্ট্রেট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্থ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

লেখক: কবি, সম্পাদক, প্রকাশক ও জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি

নিবন্ধ

যে উচ্চারণে সূর্যস্নান

পারভিন আক্তার

সূর্য আমি
অস্তমিত হবো জানি
ধরণীর বুকে তবু চিহ্ন রেখেই যাবো

নশ্বর এই পৃথিবীতে স্বীয় কর্মে অবিনশ্বর হওয়াদের তালিকা খুব বেশি বড়ো নয়। তাদের মধ্যেই এমন একজন শিল্পী যিনি বিশ্ব ক্যানভাসে এঁকেছেন বাংলাদেশের মানচিত্র, বাঙালির অহংকারের সবচেয়ে বড়ো রত্নপাথর, রাজনীতির কবি, ইতিহাসের সুনিপুণ কর্মকার, স্বপ্ন ফোটানোর এক মালী, জাতিকে এক সুতায় গাঁথায় নিখুঁত কারিগর, তিনি বাংলার বন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ইতিহাস বলে, এ উপমহাদেশে প্রায় ৫৩টি (সিন্ধি, বিহারি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি) ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তা রয়েছে, কিন্তু বাঙালি ছাড়া কারোরই ভাষাভিত্তিক স্বাধীনতা নেই। অহংকারের স্থিরীকৃত এই ভূখণ্ডের পেছনে রয়েছে অনেক দীর্ঘ ইতিহাস। গঙ্গা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসতে এ জাতিকে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতৃত্বের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে দীর্ঘকাল। রাজটিকা নিয়ে স্রষ্টার বিশেষ কৃপামণ্ডিত উপমহাদেশের তিনিই একমাত্র নেতা, যাঁর নেতৃত্বে বাঙালির বীরত্বের পঙ্‌ক্তিমালায় নির্মিত হয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকাব্য। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় তাঁর *বাঙালির ইতিহাস: আদি পর্ব*-তে বলেন 'গৌড় নাম লইয়া বাংলার সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন, সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটিল বঙ্গ নামের যে বঙ্গ ছিল, আর্য্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত এবং যে বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই; তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরেজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যদিও আজিকার বাংলাদেশ আকবরী সুবা বাংলা অপেক্ষা খর্বিকৃত'। পরবর্তীতে 'বঙ্গভঙ্গ', জাতিগত এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি উপমহাদেশে বাংলাদেশকে আয়তনে যথেষ্ট ছোটো করলেও স্বীয় মর্যাদায় সে আজ সমুন্নত। ১৯৪৭-এর পরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে বরং ১৯৭১-এর পেছনে যে ছোটো ছোটো সুড়ঙ্গগুলো আমাদের স্বাধীন বাংলার পথ দেখিয়েছিল, আত্মপরিচয়ে জাতিসত্তার পরিচয়ের চরম সত্য যে উপলব্ধি স্নায়ুতে প্রোথিত করেছিল, ভাষা-সংস্কৃতি যে জাতিসত্তার সবচেয়ে বড়ো উপাদান– সে বোধে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেটাই প্রণিধানযোগ্য। আর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল গাঁথুনিতে বৈপ্লবিক সে সকল আন্দোলনের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। তৎকালীন পাকিস্তানের গণপরিষদের কার্যবিবরণীতে আলোচ্য কর্মসূচি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা স্বীকৃত অফিসিয়াল ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় না করার আক্ষেপ, ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, বৈষম্য প্রবল বাঙালি জাতিকে অধিকার আদায়ে আগ্রাসী হয়ে টিপু সুলতানের সিংহ-সম আদর্শে বাঁচতে সক্ষম করেছেন বঙ্গবন্ধু। একটি জাতির নিভৃত চাওয়া-পাওয়াগুলো যখন তাঁর নেতৃত্বের জায়গায়ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়, তখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সকল বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক কেন অনুসরণ করবে না? হাসান আজিজুল হকের ভাষ্যে–

'পরাধীন বাংলায় তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী থেকে ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেন সকলের প্রিয় 'মুজিবভাই', জনগণের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত হয়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন'। প্রখ্যাত লেখক আবুল ফজলের ভাষ্যে- 'সারা বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নাম এক জাদুমন্ত্র। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু-বৃদ্ধ, অন্তঃপুরিকা বধূ সকলের মনে এ নাম বয়ে আনে এক অপূর্ব শিহরণ। এ নাম যেন তাদের সামনে অন্ধকারে এক উজ্জ্বল প্রদীপশিখা। শেখ মুজিব বাঙালির মনে অনেক সূর্যের আশা'। বঙ্গবন্ধু বাঙালির জন্য স্রষ্টার বিশেষ আশীর্বাদের বরপুত্র। স্বাধীনতা লাভেই তাঁর চূড়ান্ত প্রাপ্তির ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা ছিল না, বাঙালি জাতিকে বিশ্ব দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতার প্রকাশ ঘটে জাতিসংঘে তাঁর স্পষ্ট সে উচ্চারণে–'শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। বাঙালির ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। জাতিকে একটি পতাকা তলে এক পরিচয়ে গৌরবান্বিত করার 'বঙ্গ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর যে অধ্যায়, সেখানে বঙ্গবন্ধুর নাম এক সাথে উচ্চারণ না করলে বাঙালির আত্মপরিচয় কখনো পূর্ণ হবে না।

বঙ্গবন্ধুর সকল ভাবনার কেন্দ্রজুড়ে ছিল মানুষের সেবা করা। তৃণমূল থেকে বহির্বিশ্ব, সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবী, পেশাজীবী থেকে মহামানবদের সংস্পর্শ, বন্দিজীবন থেকে সদ্য স্বাধীন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁর অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উন্নত রুচিবোধ, স্বচ্ছ-নিষ্কলুষ ভাবনার পসরা দিয়ে চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সাজাতে, বাংলার তীরেই ভিড়িয়েছিলেন তাঁর ভালোবাসার নৌকা। শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা থেকে শুরু করে কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্যসহ আইনের ক্ষেত্রেও চেয়েছিলেন আধুনিকায়ন। 'কথায় কথায় মামলা নয়, কথায় কথায় আইনি মারপ্যাঁচ নয়'। হ্যাঁ, তাঁর ছোটো ছোটো কথাগুলো ছিল অর্থবহ। বোধ করি তাঁর বিভিন্ন সময়ে দেওয়া বক্তব্যগুলোতে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যার জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা ছিল না। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি দেওয়া জাতীয় সংসদের নাতিদীর্ঘ ভাষণের আইনব্যবস্থা ছোঁয়া অংশটুকু এরকম- 'আপনি তো উকিল, স্পিকার সাহেব। আল্লাহর মর্জি, যদি একটা মামলা সিভিল কোর্টে হয়, বিশ বৎসরেও সে মামলা শেষ হয় কিনা, বলতে পারেন আমার কাছে? বাপ মরে যাওয়ার সময় মামলাটি দিয়ে যায় ছেলের কাছে। আর উকিল দিয়ে যায় তার জামাইয়ের কাছে সেই মামলা। আর ক্রিমিনাল কেস হলে তো লোয়ার কোর্ট, জজ কোর্ট কোথাও বিচার নাই। জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড। উই হ্যাভ টু মেইক এ কমপ্লিট

চেঞ্জ। এই সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে, মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়। ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। 'কলোনিয়াল পাওয়ার' এবং রুল নিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। এখানে 'জুডিশিয়াল সিস্টেম'-এর অনেক পরিবর্তন দরকার'। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবা এবং গুরুজনদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, মামলার বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে শেখ বংশের ব্যাবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়েছিল, জমিদারি শেষ হয়েছিল। সামান্য তালুক এবং খাস জমির উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়েছিল শেখ বংশের পূর্বপুরুষদের। এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এবং সদ্য স্বাধীন দেশকে সোনার বাংলা গড়ায় বিভোর জাতির পিতা প্রচলিত আইনকানুনসহ অনেক কিছুর আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া এবং মামলা সংক্রান্ত জটিলতাগুলো বঙ্গবন্ধু একজন সাধারণ মানুষের জায়গায় থেকে অনুধাবন করতেন। মামলার জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতা রোধে আইনবিদদের কাছে বর্তমানে মেডিয়েশন একটি জনপ্রিয় পন্থা। বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবনে কম করে হলেও পাঁচটি এরকম মধ্যস্থতা বা মেডিয়েশনের মাধ্যমে মামলার জটিলতা এড়ানোর উদাহরণ মেলে– যা তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এবং অন্যান্য ঘটনা বিশ্লেষণে পাই। বর্তমান সময়ে দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৮৯-এ ধারা (২০০৩ সালে সংযোজিত), অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩-এর ২২,২৪ ধারা এবং ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫-এর ১০ ধারা বঙ্গবন্ধুর চাওয়া, চিন্তা এবং ভাষ্যের প্রত্যক্ষ ফসল।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশ। বিধ্বস্ত দেশের সাথে স্বজন হারানোর ক্ষত, বেসামাল জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে উন্নয়নের পথে মাথা তুলে দাঁড়ানোই ছিল তখন বঙ্গবন্ধুর সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন– A well plan is half the victory। সেজন্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি হাতে নিয়েছিলেন যুগোপযোগী সব পরিকল্পনা। স্বল্পতম সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন, আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের সুসমন্বয় সংঘবদ্ধ জাতির যা পূর্বশর্ত। অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতেই বঙ্গবন্ধু কৃষি নির্ভরতায় জোর দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ। ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা এড়িয়ে কৃষি শস্যক্ষেত্রে উৎপাদনের গতিধারা অব্যাহত রাখতে এলাকাভিত্তিক সমবায় সমিতির ধারণা তাঁরই জ্ঞান প্রসূত ছিল। উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসময় গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাই বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূতিকাগার। শিক্ষাব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মানসে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন যথেষ্ট ইতিবাচক ছিল বলেই সময়ের ব্যবধানে আজও তাঁর যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং এখনো বুদ্ধিজীবীরা তাঁর অংশবিশেষ বাস্তবায়নের দাবিতে মুখর থাকে। উন্নয়নের প্রশ্নে প্রশাসনিক জটিলতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, স্বাধীনতা উত্তর বক্তৃতাগুলোতে সেই চাপা কষ্ট এবং ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। আইনের সমতার পাশাপাশি নিরপেক্ষ শ্রেণি বৈষম্যহীন, অর্থনীতিতে সমৃদ্ধশালী, সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে জাগ্রত এক জাতি গঠনে তিনি যেখানে ছিলেন সংকল্পবদ্ধ, সেখানে রাজনৈতিক অপশক্তি যারা যুদ্ধকালীন দেশের বিরোধিতা করেছিল তারাই ক্ষমতা লোভী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ঘৃণ্য লালসা চরিতার্থ করার জন্যই বঙ্গবন্ধুকে প্রকৃত সহযোগিতার পরিবর্তে ব্যর্থ প্রমাণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু যে কতটা সার্থক ছিলেন স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরে এসেও তাঁর পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের সময়োপযোগিতা সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।

বঙ্গবন্ধু নিজের দেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ছিলেন চির সমুন্নত। আপোশহীন তাঁর নেতৃত্ব তাই তো ফিদেল কাস্ত্রোর চোখে ধরা দিল হিমালয় হয়ে। আবার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বলয়ের এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সমান্তরালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দায়িত্বশীল পিতা, নিজের আদর্শে স্ত্রীকে দীক্ষিত করার মতো দক্ষ প্রেমিক , নিজের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বের সবটুকুতে কাণ্ডারি হয়ে হাল ধরার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু। সন্তান বাৎসল্যের পারিবারিক বলয়ের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পিতা। জ্ঞানপিয়াসু শিল্পমনা মানুষটা ক্ষমতা নয়, শিক্ষা গ্রহণেই প্রকৃত মুক্তি সন্তানদের মজ্জাতে সেই ধারণাই প্রোথিত করেছিলেন। মেধার মূল্যায়নে তাই কখনো তাঁর কার্পণ্য ছিল বলে দৃশ্যমান হয়নি। ভালোবাসা যেমন ছিল তাঁর একমাত্র সম্পদ এবং শক্তি, তেমনই এই ভালোবাসাই ছিল তাঁর দুর্বলতা। সরলতার অহংকার আর মানুষকে অবিশ্বাসে অনীহা ষড়যন্ত্রকারীদের প্রকৃত রূপ উন্মোচনে তাঁকে করেছিল ব্যর্থ।

মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব। বিশেষ মানুষ মাত্রই অশেষ মানুষ। মৃত্যু তো অমোঘ নিয়তি। দৈহিক অনুপস্থিতিতে তাঁর আদর্শের দিগন্তজোড়া বিস্তৃতি কালান্তরে যে সে মানুষটিকে মৃত্যুহীন করে তুলতে পারে সেটা বোঝার মানসিক সক্ষমতা ষড়যন্ত্রকারীদের নেই। বাঙালি আমৃত্যু শোক বিলাসী হবে তাঁর এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটির জন্য, তাঁর আদর্শের জয়োৎসবে প্রতিটি বাঙালি হয়ে উঠবে এক এক জন শেখ মুজিবুর রহমান। টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে তাঁর দেহাবশেষ মিশে গেলেও বাংলার মাটিতে তিনি যে ভালোবাসার বীজ বুনে গেছেন তা বিকশিত হবেই মহাকাশের সীমানায়। মহানায়কের আদর্শ হোক আগামীর নায়কদের আদর্শ। মানুষ, মানবতাকে সর্বাগ্রে রেখে লিপিবদ্ধ হোক আজকের শপথ।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো ভাস্কর্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড়ো ভাস্কর্যটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) নির্মাণ করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বজ্রকণ্ঠ'। নগরীর হালিশহরের বড়পুল মোড়ে নির্মিত হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড়ো এই ভাস্কর্যটি। 'বজ্রকণ্ঠ' ভাস্কর্যটি নির্মাণ ও স্থাপন কাজে চসিকের ব্যয় হয়েছে ৮৭ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এ ভাস্কর্যটির উচ্চতা সাড়ে ২২ ফুট, বেজসহ (বেদি) পুরো ভাস্কর্যের উচ্চতা ২৬ ফুট। সাদা সিমেন্টের (আরসিসি) ঢালাইয়ের মাধ্যমে ভাস্কর্যটি স্থায়ী রূপপ্রাপ্ত হয়, যার ওজন প্রায় ৩০ টন। এর আগে প্রায় ৪ মাস মাটি (মডেলিং ক্লে) দিয়ে মূল ভাস্কর্যের আদলটি তৈরি করা হয়েছিল। মাটির তৈরি ওই আদলকে প্রথমে জনসম্মুখে উন্মোচিত করা হয়েছিল। এ বেদির (বেজ) ভূগর্ভস্থ অংশ ও উপরিতলের অংশে রডের কাঠামো এমনভাবে দেওয়া–যা স্বাভাবিক মাত্রায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

প্রতিবেদন: রূপশ্রী চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার তুলে দেন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)-এর বোর্ড সভাপতি Dr. Ngozi Okonjo-Iweala–পিআইডি

শেখ হাসিনার অর্জন

শামসুজ্জামান শামস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। ত্যাগে, দয়ায়, ক্ষমায় ও সাহসের মহিমায় শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের বিস্ময়। শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগেরই নেতা নন, তিনি আজ দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে স্টেটসম্যান বা রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। তিনি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে দেশের চেহারা বদলে দিয়েছেন। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের একজন অন্যতম পরিশ্রমী এবং মেধাবী নেত্রী। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর থেকেই দেশের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ মনোযোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাঁচ বছরের অভাবনীয় উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় দেশ ঘুরে দাঁড়ায়। ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে এসেছে গতিশীলতা। মানুষের দৈনন্দিন আয় বেড়েছে। সরকারের ব্যাবসাবান্ধব নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে দেশে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান গড়ে উঠছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি-প্রবাহের গতিও উচ্চমুখী। সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক, মূল্যস্ফীতির হার, প্রবৃদ্ধির হার, রেমিটেন্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে দেশ। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য কমানো, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, নারী অধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বিশ্বের সৎ নেতৃত্বের তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান তৃতীয়। বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স'-এর গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। যেমন:

২০১৯: আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করে ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন।

২০১৯: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' পদক দেওয়া হয়।

২০১৯: বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

২০১৯: জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা (ইউনিসেফ) তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ' সম্মাননায় ভূষিত করে।

২০১৯: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মর্যাদাপূর্ণ 'টেগর পিস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি। এর আগেও বঙ্গবন্ধুকন্যা ভারতের মর্যাদাবান 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক'-এ ভূষিত হন।

২০১৮: মানবিক কারণে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে নজির স্থাপন করায় ইন্টারপ্রেস সার্ভিস নিউজ এজেন্সি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে।

২০১৮: রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে দাতব্য সংগঠন 'গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন'-এর পরিচালনা পর্ষদ শেখ হাসিনাকে 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে।

২০১৮: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গ্লোবাল সামিট অব উইমেন শেখ হাসিনাকে নারী নেতৃত্বের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার প্রদান করে।

২০১৬: লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউএন উইমেনের পক্ষ থেকে 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরামের পক্ষ থেকে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৬: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে।

২০১৫: জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবিলায় অবদানের জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার– 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০১৫: ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন ও তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ

অবদানের জন্য জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ITU-এর 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার'-এ ভূষিত করে।

২০১৫: রাজনীতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনে প্রধানমন্ত্রীকে 'Women in Parliaments (WIP) Global Forum Award'দেওয়া হয়।

২০১৪: নারী ও শিশুশিক্ষা ও উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Peace Tree Award-এ ভূষিত করে।

২০১৪: খাদ্য উৎপাদন ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রীকে সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২০১৩: খাদ্য নিরাপত্তা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কো-অপারেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'South South Award' পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১৩: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপ্রসূত 'একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প'-এর জন্য 'ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় তিনি সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক 'Manthan Award' পদকে ভূষিত হন।

২০১৩: জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Diploma Award পদকে ভূষিত করে।

২০১২: শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করে।

২০১২: বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য UNESCO প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Cultural Diversity পদকে ভূষিত করে।

২০১১: ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সের স্পিকার Jhon Bercwo MP প্রধানমন্ত্রীকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দূরদর্শী নেতৃত্ব, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি ও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য Global Diversity Award প্রদান করেন।

২০১১: স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য International Telecommunication Union (ITU) South South News এবং জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'South South Award: Digital Development Health' পুরস্কারে ভূষিত করে।

২০১১: গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য ডফিন বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্স স্বর্ণপদক প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

২০১১: বাংলা একাডেমি সম্মানসূচক ফেলোশিপ পান শেখ হাসিনা।

২০১০: শিশুমৃত্যু হ্রাস সংক্রান্ত MDG-4 অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রীকে Millenium Development Goal (MDG) Award প্রদান করে।

২০১০: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য St.Petrsburg University সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

২০১০: বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক ২০০৯'-এ ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০০৫: গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তির পক্ষে অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া।

২০০০: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ম্যাকন ওমেনস কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র 'পার্ল এস বাক পদক' প্রদান করে।

২০০০: ব্রাসেলসের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় Doctor Honorious Causa প্রদান করে।

২০০০: University of Bridgeport কানেকটিকাট, যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Doctor of Humane letters প্রদান করে বিশ্বশান্তি ও উন্নয়নে অবদানের জন্য।

১৯৯৯: মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৯৯: ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ FAO কর্তৃক 'সেরেস পদক' লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৮: নরওয়ের রাজধানী অসলোয় মহাত্মা গান্ধী ফাউন্ডেশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এম কে গান্ধী' পুরস্কারে ভূষিত করে।

১৯৯৯: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব লজ' পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৯৮: শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে 'মাদার তেরেসা পদক' প্রদান করে নিখিল ভারত শান্তি পরিষদ।

১৯৯৮: পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো শেখ হাসিনাকে 'ফেলিক্স হুফে বইনি' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে।

১৯৯৮: শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতীর এক আড়ম্বরপূর্ণ বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৯৭: লায়ন্স ক্লাবসমূহের আন্তর্জাতিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'রাষ্ট্রপ্রধান পদক'-এ ভূষিত হন শেখ হাসিনা।

১৯৯৭: রোটারি ইন্টারন্যাশনালের রোটারি ফাউন্ডেশন শেখ হাসিনাকে 'পল হ্যারিস ফেলো' নির্বাচিত করে এবং ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের সম্মাননা মেডেল প্রদান করে।

১৯৯৭: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শেখ হাসিনাকে 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক ১৯৯৭' প্রদান করে।

১৯৯৭: গ্রেট ব্রিটেনের ডান্ডি অ্যাবার্তে বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ডক্টর অব লিবারেল আর্টস' ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৯৭: জাপানের বিখ্যাত ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৯৭: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লজ' উপাধি প্রদান করে।

চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনা এখন বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘমেয়াদি নারী সরকারপ্রধান। তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছেন উন্নয়ন-অগ্রগতি ও ডিজিটালাইজড নতুন প্রজন্মের উপযুক্ত বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দীর্ঘ ৬২ বছর পর ছিটমহলবাসীকে দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। স্থল-সমুদ্র বিজয়ের পর পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেলসহ মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু করেছেন। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাকাশে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখিয়েছে রাষ্ট্রনায়ক ও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার। বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নের মডেল, ভাইব্রেন্ট ইকোনমি দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত– এসবই সম্ভব হয়েছে তাঁর পরিপক্ব ও ভিশনারি নেতৃত্বের কারণে।

লেখক: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

৭ই মার্চের ভাষণ ধারণের অডিও-ভিডিও যন্ত্র ডিএফপি'র জাদুঘরে

মোহাম্মদ আলী সরকার

৭ই মার্চ ১৯৭১ বাঙালির জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন লাখো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুনিয়েছিলেন সেই অমর কাব্য– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের অডিও-ভিডিও চিত্রধারণের গর্বিত অংশীদার চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)। ঐতিহাসিক এই ভাষণ ও ভাষণ-ধারণের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রসমূহ যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে ডিএফপি'র জাদুঘরে। ১৬ই আগস্ট তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ রাজধানীর ১১২ সার্কিট হাউস রোডে অবস্থিত তথ্য ভবনের ১৩ তলায় এ জাদুঘর উদ্‌বোধন করেন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি নিরাপদে রাখতে ডিএফপি'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের পর চলচ্চিত্র বিভাগের তৎকালীন পরিচালক/কম্পট্রোলার জনাব মুহিব্বুর রহমান খায়ের এই ভাষণ সংরক্ষণ ও এর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণে ব্যবহৃত ক্যামেরা ও শব্দ ধারণ যন্ত্র ফটোফিচার: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

উদ্‌বোধনের পর ডিএফপি জাদুঘর পরিদর্শনরত তথ্যমন্ত্রী, তথ্যসচিব, ডিএফপি'র মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

তাঁরই উদ্যোগে ১৯৭১ সালের ৯ই এপ্রিল ভাষণের অডিও-ভিডিও ফুটেজসহ একটি ট্রাঙ্ক সহকারী চিত্রগ্রাহক জনাব আমজাদ আলী খন্দকার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর টহল এড়িয়ে নদীপথে মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যান। এ সময়ে জনাব মুহিব্বুর রহমান খায়েরও সেখানে উপস্থিত হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অত্যন্ত গোপনে ভাষণের রিল ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ভর্তি ট্রাঙ্কটি সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর সেখান থেকে ট্রাঙ্কটি পুনরায় অফিসের স্টোরে সংরক্ষণ করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এই ভাষণটি রক্ষা করার জন্য চলচ্চিত্র শাখার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীরা আবারো সচেষ্ট হন। তারা ভাষণের মূল পিকচার নেগেটিভ ও সাউন্ড নেগেটিভসহ অন্যান্য ফুটেজ ভিন্ন একটি ফিল্মের ক্যানে ঢুকিয়ে ফিল্ম লাইব্রেরিতে লুকিয়ে রাখেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক গুপ্ত অবস্থাতেই তা ডিএফপি'তে সংরক্ষণ করা হয়।

এই ক্যামেরায় ধারণ করা ভাষণের কপিই পরবর্তীকালে ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়, যা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ক্যামেরায় ধারণ করা ভাষণের কপি ও অন্যান্য ফুটেজ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভেও সংরক্ষণ করা আছে।

এই ভাষণ ধারণের জন্য ব্যবহৃত জার্মানিতে তৈরি ৩৫ মিলিমিটার (ARRI) ক্যামেরা, কাঠের ট্রাইপড, সাউন্ডপ্রুফ কভারবক্স এবং নাগরা (NAGRA) শব্দধারণ যন্ত্র ডিএফপি'র জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও এই ভাষণ সংরক্ষণের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো প্রদত্ত সনদও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে।

শুধু ৭ই মার্চের ভাষণ নয়, ডিএফপি'র এ জাদুঘরে চলচ্চিত্র শিল্পে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তি সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যাবে। কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া ১৬ মিলিমিটার ও ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও এ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যা চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আগ্রহী নতুন প্রজন্মকে জানতে সাহায্য করবে ও অনুপ্রেরণা জোগাবে।

লেখক: সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

সাক্ষরতায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

সাইমন ইসলাম সাগর

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে 'সাক্ষরতা' প্রত্যেকটি দেশের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি দেশের অগ্রযাত্রায় এর ভূমিকা অসীম। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতার রয়েছে নিবিড় যোগসূত্র। আবার শিক্ষা এবং উন্নয়ন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে দেশের শিক্ষার হার যত বেশি, সে দেশ তত বেশি উন্নত। শিক্ষা সাধারণত তিনটি উপায়ে অর্জিত হয়। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা লাভ করে থাকে। তবে বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকটি দেশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের সাক্ষরতার হার বাড়াতে সচেষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর এ দুনিয়াতে যেখানে অনেকে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যস্ত সময় পার করছে, সেখানে আবার বিশ্বে অনেক মানুষই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এখনো লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে যারা নিজের নাম-পরিচয়টা পর্যন্ত লিখতে পারে না। বিশ্বের নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৫ সালের ৮-১৯শে সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে 'বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৮৯টি দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষামন্ত্রী ও পরিকল্পনাবিদরা অংশগ্রহণ করেন। ওই সম্মেলনে প্রতিবছর ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো প্রথম 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালন করে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রথম 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'Literacy teaching and learning in the Covid-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies'।

সাক্ষরতা কী– এ ধারণাটি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে বার বার। এক সময় ছিল যখন কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা প্রদান করে। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো একে পুনঃসংজ্ঞায়িত করে। বর্তমানে যিনি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবেন, বাক্য লিখতে পারবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবেন তাকে সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন বলা হয়। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাবনিকাশ করা হয়। তবে বর্তমানে এই সংজ্ঞাটিও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অনেক আন্তর্জাতিক ফোরাম বা কনফারেন্স থেকে সাক্ষরতার সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে সাক্ষরতা সরাসরি ব্যক্তির জীবনযাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে জাতিকে প্রথমেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু

বছরের প্রথম দিনে নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীরা

বিশ্বাস করতেন, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে পারে না। তাই আমরা দেখি, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তখন তিনি সর্বাধিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তার ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর আসে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা। তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি অবৈতনিকও করলেন। বঙ্গবন্ধু সময়ের চাহিদা পূরণ করে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল নতুন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা। ১৯৭৪ সালের ৭ই জুন সেই কমিশন রিপোর্ট দাখিল করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আর প্রকাশিত হয়নি। আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছিল কালো আইন দ্বারা। বঙ্গবন্ধু সেই আইন পরিবর্তন করে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। গণশিক্ষা বিস্তার তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের প্রথম বাজেটে জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করেছিলেন আড়াই কোটি টাকা। তিনি সবসময়ই গণমুখী শিক্ষাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এজন্যই ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হাওয়া সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে তাঁর নির্দেশনায় একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যাপ্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাঠদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১-এর অন্যতম লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর আলোকেই সরকার ইতোমধ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এবং 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সরকারের শিক্ষা খাতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিকে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে, ঝরে পড়া এবং বাল্যবিয়ে কমেছে। প্রাথমিকের এক কোটি ৩০ লাখ শিশু উপবৃত্তি পাচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও অর্জিত হয়েছে জেন্ডার সমতা। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় চার কোটি শিশু বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই পায়। সাক্ষরতার হার ১০ বছরে বেড়ে হয়েছে ৭৩ শতাংশ, যা শিক্ষা অবকাঠামোতেও বিপ্লব সাধন করেছে। শিক্ষাবিদরা বলেন, বিনা মূল্যের বই, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিংসহ সরকারের নানা পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা খাতে সুফল মিলছে এখন।

২০০৯ সালে বাংলাদেশে কারিগরিতে শিক্ষার্থীর হার ছিল ১ শতাংশেরও কম। বর্তমানে কারিগরিতে শিক্ষার্থীর হার প্রায় ১৬ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ শতাংশ এবং ২০৩০ সালে ৩০ শতাংশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। মেয়েদের জন্য সাত বিভাগে করা হয়েছে সাতটি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটও। কারখানার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৩ হাজার ৩৩১টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় স্থাপন করা হয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। ৬৫ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীরাও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পড়ালেখা করছে। আগে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা, কলেজে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হওয়ার নির্ধারিত কোনো সময় ছিল না। পরীক্ষার ফল বের হতে তিন-চার মাস সময় লাগত। কিন্তু এখন সব কিছুতেই ফিরে এসেছে শৃঙ্খলা। প্রতিবছর ১লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি এবং ১লা এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আর নিয়মিতই ৬০ দিনের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফল। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের ক্লাস শুরু হয় ১লা জানুয়ারিতে। আর উচ্চ মাধ্যমিকে ক্লাস শুরু হয় ১লা জুলাই।

স্কুল ও কলেজের বাইরে পাহাড়ি এলাকা, দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে, হাওর, বাঁওড়, চর, প্রাকৃতিক বিপর্যস্ত এলাকা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, অতি বঞ্চিত শিশু, শ্রমিক, ঝরে পড়া, পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান, হরিজন বা নিচুবর্ণের শিশুদের শিক্ষার জন্য নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। বৃত্তিমূলক, কারিগরি এবং কর্মমুখী শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে এবং রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে সরকার চায় নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে। তাই এটিকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করছে সরকার। বর্তমানে ব্যাবসাবাণিজ্য, প্রশাসন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। তাই নব্য সাক্ষরদের যদি এ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে তাদের পক্ষে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকার নিরক্ষরদের সাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি তাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আবার এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ৪ নম্বরে। সরকার এসডিজি অর্জনে বদ্ধপরিকর। বর্তমান শিক্ষানুরাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সবার জন্য শিক্ষা' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'সমূহ সফলভাবে অর্জনের জন্য ইউনেস্কো মহাসচিব ইরিনা বোকোভা ২০১৪ সালে 'শান্তি বৃক্ষ' পদক প্রদান করেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সঞ্চয় স্কিম চালু

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সঞ্চয় স্কিম চালু করেছে। মাসিক কিংবা ত্রৈমাসিক কিস্তিভিত্তিক এ সঞ্চয় স্কিম খুলতে পারবেন প্রবাসীরা। সঞ্চয় স্কিমের মেয়াদ এক বছর কিংবা এর অধিক হতে পারবে। সঞ্চয় স্কিমের স্থিতি জামানত রেখে ঋণ নেওয়ারও সুযোগ পাবেন তারা। ৯ই আগস্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবাসীদের জন্য তিন ধরনের সঞ্চয় বন্ড চালু রয়েছে। এগুলোতে কেবল বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। এখন স্থানীয় মুদ্রা টাকায়ও বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগে আনতে এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে এ উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে প্রবাসে কর্মরতরা বিশেষ করে স্বল্প আয়ের প্রবাসীরা এ সঞ্চয় স্কিমের দ্বারা উপকৃত হবেন। সার্কুলারে বলা হয়েছে, বিদেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে কিংবা এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিটেন্স নগদায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বেড়াতে আসার সময় প্রবাসীর সঙ্গে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দ্বারা এবং প্রবাসীদের নামে পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি নগদায়নের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে অর্থ জমা করা যাবে। বিদেশ গমনের পূর্বেই কোনো জমা প্রদান ছাড়াই এ জাতীয় হিসাব খোলা যাবে। এসব সঞ্চয় স্কিমে প্রতিযোগিতামূলক হারে সুদ প্রদান করতে পারবে ব্যাংক। একইসঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের মাধ্যমে পরিচালিত হিসাব বিবেচনায় সুদে বিশেষ সহায়তা প্রদানের কথাও সার্কুলারে বলা হয়েছে। এছাড়াও এ সঞ্চয় স্কিমে প্রবাসীদের জন্য আরো সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

রবীন্দ্রনাথ এক আলোকবর্তিকা

ফারিহা রেজা

বাঙালির প্রতিটি জীবনপর্বে রবীন্দ্রনাথ এক অপরিহার্য জীবনাদর্শ। তিনি বাঙালির জীবনের আলোকবর্তিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল ও উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জীবনের নানামাত্রিক দর্শন বাঙালির মননে, জীবনের প্রতিটি পর্বে যে ভালোবাসার অবয়ব সৃষ্টি করেছে, তা যেন এক আলোকবর্তিকা: যে দর্শন আঁধারেও বাঙালিকে পথের দিশা দেয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালির জীবন কল্পনাই করা যায় না।

আমরা কোথায় না পাই কবিগুরুকে। ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের সবক্ষেত্রেই পাওয়া যায় তাঁকে। সব ক্ষেত্রে তিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন, তাই আমাদের মন ও মননে সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি অনুভব হয়।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বাঙালি জাতিসত্তার বরেণ্য এই মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা তাঁকে ব্যথিত করত। পরাধীনতার বন্ধন তাঁকে পীড়িত করেছে সর্বদাই। মানুষ ও প্রকৃতিকে তিনি ভালোবেসেছেন। অশুভ অসুন্দরকে তিনি জীবনমুখী নয়; জীবনবিরোধী বলেই জানতেন। তিনি সমাজে সাম্প্রদায়িকতা দেখেছেন, ফ্যাসিবাদের উত্থান দেখেছেন। সমাজে দেখেছেন শাসন ও শোষণ। সুন্দর ও মনোহর নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের জীবনে। হতাশা কাটিয়ে আশার কথা, জাগরণের কথা শুনিয়েছেন চারপাশের মানুষকে।

রবীন্দ্রনাথ পরাধীন রাষ্ট্রে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ইউরোপীয় রেঁনেসার আদর্শবাদকে ধারণা করেছিলেন। তিনি নিজের কালের হয়েও সর্বকালের। ছবি এঁকেছেন, গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গীতিকবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া–সব মাধ্যমে সমান অবদান তাঁর। তিনি তাঁর লেখনীতে ব্যক্তি মানসকে সামাজিক মানসের প্রতিটি স্তরে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। সমাজের বৈপ্লবিক সংস্কার কামনা করেছেন তিনি। সামাজিক কুপ্রথা, কুপ্রভাব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মীয় জাতপাতকে অতিক্রম করেছিলেন।

ইংরেজ শাসকদের শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি মোহিত হননি। এদেশের কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে কাজ করেছেন। কৃষি ও কৃষকদের পদ্ধতিগত সংস্কার কামনা করেছেন। কৃষিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। পল্লির শ্রীবৃদ্ধির জন্য অহর্নিশি খেটেছেন। শিল্পস্থাপনের পাশাপাশি সমবায় কৃষি গড়ে তুলতে চেয়েছেন কৃষকের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবার লক্ষ্যে। ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য বিলেতে পাঠিয়েছিলেন ছেলে ও জামাতাকে। রবীন্দ্র সাহিত্য শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের। তিনি যেমন ধনীর তেমনি নির্ধনেরও। রবীন্দ্রনাথ সকলের। তিনি সকল বাঙালির। বাঙালির সকল প্রয়াসে এবং সকল অবদানেই তাঁকে পাওয়া যায়।

জমিদার বংশে জন্ম নিয়েও তিনি প্রান্তিকজনকে ভুলে জাননি। একসময় কুষ্টিয়ায় তাঁত বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করে মূলধন সংগ্রহ করে এনে পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন করলেন। ১৯০৮ সালে দু'তিনটি গ্রাম নিয়ে আদর্শ পল্লি

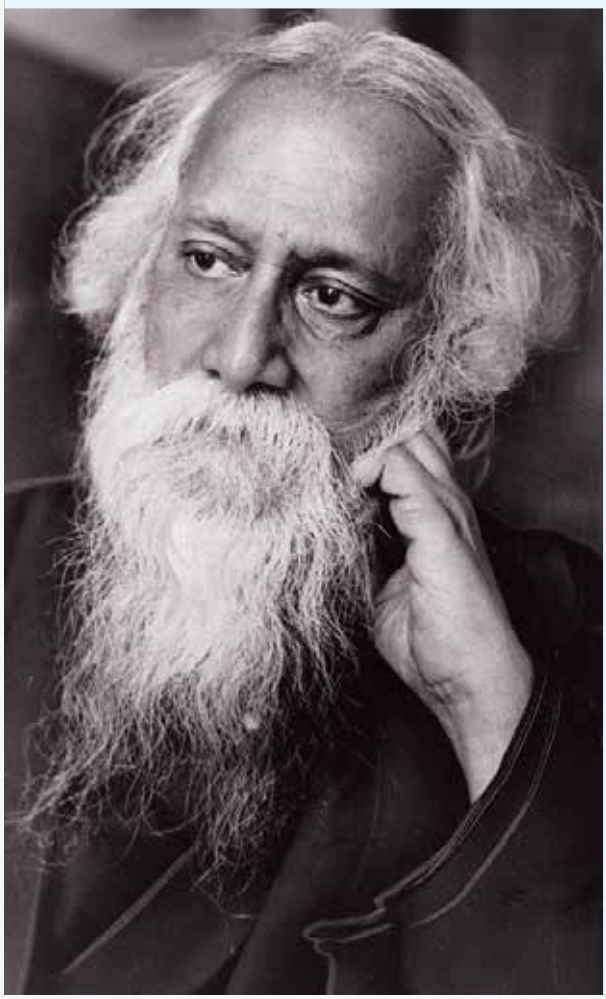

গঠনের চেষ্টা করলেন তিনি। শিলাইদহে ৮০ বিঘা আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নতুন ধরনের লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ১৯১৩ সালে দেড় বছর বিদেশে কাটিয়ে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। ঐ বছরেই ১৩ই নভেম্বর নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছে। নোবেল পুরস্কারের ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা তিনি দিলেন বিশ্বভারতীকে। বিশ্বভারতী টাকাটা বিনিয়োগ করেন পতিসর কৃষি ব্যাংকে। কিন্তু সে সময় 'রুরাল ইনডেব্টনেস অ্যাক্ট' প্রবর্তন হওয়ার ফলে প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আর ফেরত নেওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের টাকা, তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে আনা টাকা, স্থানীয় আমানতকারীদের টাকা সব মিলে কৃষি ব্যাংক লাটে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই আধুনিক মনস্ক ছিলেন। তিনি নতুনকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে শিখেছিলেন। ১৯১৭ সালে সবুজপত্রে প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টাকে সোৎসাহে সমর্থন জানালেন। চলতি ভাষায় প্রথম গল্প লিখলেন, 'পয়লানম্বর'। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে 'রাখিবন্ধন' উৎসব প্রচলন করলেন। তিনি বঙ্গবঙ্গের বিরোধী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে অবশ্য সে সময় অনেক বুদ্ধিজীবী বাঁকা চোখে দেখেছেন। রাখিবন্ধন উৎসবের তিনি সদলবলে চিৎপুরের

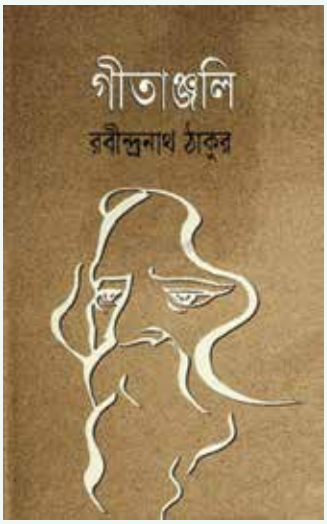

মুসলনমান বস্তিতে গিয়ে জনে জনে রাখি পড়ালেন। মসজিদে গিয়ে মৌলবিদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে আসলেন রবীন্দ্রনাথ। গান লিখলেন, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল...'। কলকাতার রাস্তায় মিছিলের পুরোভাগে তখন রবীন্দ্রনাথ। একসময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেননি। এ নিয়েও সে সময় বহু সমালোচনার ও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। ধর্ম নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনি ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এক ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। পুণ্যাহ উপলক্ষে শিলাইদহে গিয়ে চিরাচরিত প্রথা ভেঙে হিন্দু-মুসলামন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবাইকে এক আসনে বসালেন। নিজে গিয়ে তাদের মাঝখানে বসেছিলেন। এক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে তিনি পাঠ করলেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ। সে সময় হিন্দু-মুসলামন ঐক্যের গুরুত্ব বিষয়েও লিখলেন– 'ইংরেজের আতঙ্ক'। ধর্ম নিয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা সংগীত কাব্যগ্রন্থের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। গলা থেকে ফুলের মালা খুলে তিনি পরিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রনাথের গান, চিন্তা, দুঃখবোধ, ছোটগল্প ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করার অবকাশ রয়েছে। বিশেষ করে তাঁর গান, যা মানুষের চিন্তার পরিধি অতিক্রম করে এক দূরলোকে ধাবিত হয়। দুঃখ নিয়ে রয়েছে তাঁর নিজস্ব এক ধরনের অধ্যাত্মবোধ, 'ও গো দুঃখ জাগানিয়া, তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ। ও গো ঘুম ভাঙ্গানিয়া ...'। গান রচনা তাঁকে নিয়ে গেছে এক অনন্য শীর্ষে। বাঙালির আনন্দের সঙ্গী তাঁর গান। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনায় একটি বিশেষ স্থানজুড়ে রয়েছে দুঃখবোধ। তাঁর পূজা পর্যায়ের গান যার নাম 'দুঃখ'। এখানে ৪৯টি গান রয়েছে। জীবনব্যাপী নানা দুঃখ, বেদনা, সংগ্রাম কবিমনকে ব্যথিত করেছে। তিনি কখনো ক্লান্ত হয়েছেন, ভেঙে পড়েননি। দুঃখ নিয়ে কবির নিজস্ব মত রয়েছে। তিনি বলেন, 'পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব অত সহজ নয়। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এই জন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে– 'ওঠ, জাগো, যথার্থ গুরুত্বপ্রাপ্ত হইয়া বোধ লাভ করো। সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম'। রবীন্দ্রনাথ ৬৫ বছরে গান লেখেন ২২৩০টি। পরবর্তী সময়ে তাঁর অনেক কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়। ১৭ থেকে ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রচুর প্রেমের কবিতা লেখেন। ১৮৯৩ -১৯০০ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে তাঁর ৭টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

বাঙালির আনন্দ ও কান্নার সঙ্গী রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সকল সংগ্রামে তাঁর গান বাঙালির সহযোদ্ধা। ফকির লালনের গানে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হন। রবীন্দ্রনাথ লালনকে প্রথম প্রাজ্ঞজনের কাছে তুলে ধরেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। সে সময় দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন। বর্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ঋতু। বর্ষা নিয়ে কবি লিখেছেন–

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায়–
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায় ॥
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার-
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিসুধা ছড়িয়ে দিয়েছেন চারপাশে। তাঁর সৃষ্টি এক আলোকবর্তিকা। মানুষের চিত্তলোকে তিনি প্রভাব ফেলেছেন, আলোকিত করেছেন মন ও মননকে। বাঙালির জীবনাচরণে এমন প্রভাব আর কেউ ফেলতে পারেনি। ৮০ বছর বয়সের জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার চিরায়ত প্রাণ জাগানিয়া অনুপ্রেরণা বাঙালি জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে থাকবে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

শোক দিবসে ডাকটিকিট, খাম এবং ডেটা কার্ড অবমুক্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, খাম এবং একটি ডেটা কার্ড অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৪ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে একটি অনুষ্ঠানে ১৮টি স্ট্যাম্প (প্রতিটি পাঁচ টাকা) সংবলিত একটি ৯০ টাকা মূল্যমানের স্ট্যাম্প শিটলেট, ১০ টাকা ও ১০০ টাকা মূল্যের দুটি খাম উদ্‌বোধন এবং ৫ টাকা মূল্যের একটি ডেটা কার্ড উন্মোচন করেন। এ উপলক্ষে একটি বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব পুনর্বহাল স্মরণে একটি ১০ টাকার ডাকটিকিট, ১০ টাকা মূল্যের একটি উদ্‌বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যের একটি ডেটা কার্ডও অবমুক্ত করেছেন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের ৬১ বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সিদ্ধান্তে ২০১০ সালের ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ছাত্রাবস্থা পুনর্বহাল করে। সিদ্ধান্তে ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুর বহিষ্কারের বিষয়টিকে অগণতান্ত্রিক ও অন্যায্য বলে অভিহিত করা হয়। উদ্‌বোধনী খাম এবং ডেটা কার্ড ১৫ই আগস্ট থেকে ঢাকা জিপিও'র ফিলাটেলিক ব্যুরো থেকে এবং দেশের অন্যান্য জিপিও এবং প্রধান পোস্ট অফিসগুলো থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

প্রতিবেদন: আহনাফ হোসেন

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা

কে সি বি তপু

বাংলার জননন্দিত সংগ্রামী নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা তাঁদের বংশের শুধু উত্তরাধিকারী নন, তাঁদের আদর্শিক একজন সুযোগ্য উত্তরসূরি। যিনি শত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে সদা ব্যাপৃত। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার মতোই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার আরাধ্য হলো– বাংলাদেশের উন্নয়ন, বাঙালির সমৃদ্ধি অর্জন এবং বাঙালি ও বাংলাদেশের বিশ্বে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়া। এলক্ষ্যে তাঁর দৃপ্ত পথচলা।

বঙ্গবন্ধু একটি সংগ্রামী নাম, ইতিহাস স্রষ্টা একটি ইতিহাস। বিশ্বে অনেক নেতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও খুব অল্পসংখ্যক নেতা ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই কালজয়ী ইতিহাসের একজন অনন্য মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। ভাষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন সংগ্রামী নেতা। বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ ছয় দফার প্রণেতা। বঙ্গবন্ধু নেতা হিসেবে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নপূরণে ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে ষাটের দশক থেকেই তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে তোলেন আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উত্তাল সমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত জাতি স্বাধীনতার মূলমন্ত্র পাঠ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে আনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাঙালি জাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠপুরুষ বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি 'স্বাধীন বাংলাদেশ'।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে বিপথগামী কিছু সেনাসদস্যের আক্রমণে শহিদ হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোরে এ কাপুরুষোচিত জঘন্য হামলাটি ঘটে। সপরিবারে শহিদ হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। সে সময় শেখ হাসিনা জার্মানিতে স্বামী বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে সন্তানসহ অবস্থান করছিলেন। শেখ রেহানাও ছিলেন বড়ো বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে।

জাতির পিতার জন্য প্রেরণা, শক্তি এবং সাহসের উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। স্বামীর সব সিদ্ধান্তে মানসিক সহযোগিতা ছাড়াও বঙ্গমাতার পরামর্শ অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়েছে। বঙ্গমাতা তাঁর পুরো জীবনে ছায়ার মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে গেছেন। কারাগার থেকে কর্মীদের কাছে খবর পৌঁছানো, যে-কোনো বড়ো সিদ্ধান্তের সময় বঙ্গবন্ধু কারাগার বা বাইরে থাকুক, বঙ্গমাতা তাঁকে সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দিয়ে গেছেন। অসম্ভব মনোবল নিয়ে একইসঙ্গে সন্তানদেরকে বড়ো করার প্রধান দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

বঙ্গমাতার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং কঠিন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্ত কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মাকে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতায় 'আসল গেরিলা' বলে অভিহিত করেন। ২০১৮ সালে বঙ্গমাতার জন্মদিনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনাসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমার মা বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন আসল গেরিলা। তিনি বলেন, আমার মা এমন গেরিলা ছিলেন, পাকিস্তানিরা কিন্তু তাঁকে ধরতে পারেনি। এমনকি কোনো রিপোর্ট লিখতে পারেনি তাঁর নামে। তিনি ছিলেন আসল গেরিলা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আম্মার যে মনোবল দেখেছি, তা ছিল কল্পনাতীত। স্বামীকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে গেছে। দুই ছেলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। তিন সন্তানসহ তিনি গৃহবন্দি। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আম্মা মনোবল হারাননি।

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় আরো বলেন, 'জেলখানায় দেখা করতে গেলে আব্বা তাঁর মাধ্যমেই দলীয় নেতাকর্মীদের খোঁজখবর পেতেন। আব্বার দিক নির্দেশনা আম্মা নেতাকর্মীদের পৌঁছে দিতেন। আব্বা কারাবন্দি থাকলে সংসারের পাশাপাশি সংগঠন চালানোর অর্থও আমার মা জোগাড় করতেন'।

'বাবার কোনো কাজেই মা প্রতিবন্ধক নন বরং সহায়ক ছিলেন' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার মা চাইলে স্বামীকে সংসারের চার দেয়ালে আবদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনো ব্যক্তিগত-পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাননি'।

বঙ্গমাতা ও বঙ্গবন্ধু মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একে অপরের পরিপূরক ছিলেন বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'জীবনের একটি বড়ো সময়ই কারাগারে কাটিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর অবর্তমানে একদিকে যেমন সংসারের দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন পরিচালনাসহ প্রতিটি কাজে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই তাঁর বক্তৃতায় মায়ের বিভিন্ন অবদান তুলে ধরার সময় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট স্মরণ করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায় পাক সামরিক সরকার। ছয় মাস পর্যন্ত তাঁর কোনো হদিস ছিল না, আমরা জানতেও পারিনি তিনি বেঁচে আছেন কি-না। এরপরে কোর্টেই বঙ্গবন্ধুকে প্রথম দেখার সুযোগ হয়। তখন পাকিস্তান সরকার আম্মাকে ভয় দেখায়, বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তি না নিলে তিনি বিধবা হবেন। আম্মা সোজা বলে দিলেন, "কোনো প্যারোলে মুক্তি হবে না। নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে কোনো মুক্তি হবে না"। সেসময় বঙ্গবন্ধু প্যারোলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গণ-অভ্যুত্থানে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়'।

ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভাষণ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলছিলেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গমাতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন, তা নিয়ে যখন অনেক আলোচনা, সেই ক্রান্তিলগ্নে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন আমার মা। বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে আমার মাকে দেখেছি, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি তিনি নিতে পারতেন। ৭ই মার্চের ভাষণের সময়ও মা বলেছিলেন, "তুমি সারাটা জীবন মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ। তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো, কী বলতে হবে। তোমার মনে যা আছে, তাই বলো"। বঙ্গবন্ধু সেই কথাই বলে গেছেন'।

২০১৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গণভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '৩২ নম্বর বাড়িতে যখন আমার বাবাকে হত্যা করা হয়, আমার মাকে খুনিরা বলেছিল আপনি চলেন। আমার মা বললেন, "কোথাও তো যাবো না। ওনাকে খুন করেছ, আমাকেও শেষ করে দাও। আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বো না"। আমার মা কিন্তু ওদের কাছে জীবন ভিক্ষা চায়নি। তাদের কাছে কোনো আকুতি মিনতি করেননি। বীরের মতো বুক পেতে দিয়েছিলেন বুলেটের সামনে'।

বাঙালির মানসপটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু আছেন অবিনশ্বর হয়ে; চেতনার দীপ্ত প্রতীক হিসেবে। শোকাচ্ছন্ন বাঙালি শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দ। বঙ্গবন্ধু বাঙালির হৃদয়জুড়ে চিরঞ্জীব। বঙ্গবন্ধু অমর– তাঁর নেতৃত্ব, বীরত্ব ও আদর্শের মৃত্যু নেই।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাঙালি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পিতা-মাতার মতোই জনগণের কল্যাণে আপোশহীন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার মতোই দেশকে ভালোবাসেন গভীরভাবে। আর দেশের মানুষও তাঁকে ভালোবাসেন। এদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে সবসময় পাশে দাঁড়ান তিনি। দেশের একজন মমতাময়ী মায়ের মতো তাঁর সকল কর্মকাণ্ড। তাঁর স্বপ্ন দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের চলমান অগ্রযাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিশ্বনেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুকন্যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মেধা আর মননে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা দিয়ে নিজেকে দক্ষিণ এশিয়ারই নয়, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নেত্রীতে পরিণত হয়েছেন বলে সুধীমহলের অভিমত।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযাত্রী বঙ্গমাতার স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁদেরই উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যাচ্ছে– এই ধারার প্রবৃদ্ধি হোক। 'এক মুজিব লোকান্তরে– লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে' বাণীর মতোই আমাদের প্রত্যাশা– বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক চেতনা বাঙালির অন্তরে সুদৃঢ় হোক এবং তা ছড়িয়ে পড়ুক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নৃত্যরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

আদিবাসী নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

সানিয়াত রহমান

এশিয়ায় নেপাল ছাড়া স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো আদিবাসী নেই। ভারত-পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও বাস করছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। তারা উপজাতি হিসেবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে 'আদিবাসী বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিবছর ৯ই আগস্ট 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া জাতিসংঘ ১৯৯৫-২০০৪ এবং ২০০৫-২০১৪ সালকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ঘোষণা করে। ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে আদিবাসী দিবস পালন করা শুরু হলেও ২০০১ সালে বাংলাদেশে আদিবাসী ফোরাম গঠনের পর থেকে বেসরকারিভাবে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণ তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, জমির অধিকার অর্জন বা টেরিটরির অধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও নাগরিক মর্যাদার স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি পালিত হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও বগুড়া ইত্যাদি জেলাগুলোতে সাঁওতাল, গন্ড, ওঁরাও, মুণ্ডারি, বেদিয়া, মাহাতো, কর্মকার, তেলি, ভুঁইমালী, কোল, কুড়া, রাজবংশী, মাল পাহাড়িয়া, মাহালী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশে ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, জমির অধিকার ও নাগরিক মর্যাদায় স্বীকৃতির দাবিতে দিবসটি উদ্‌যাপন করে থাকে। সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ। তারা ক্রমেই মূলধারা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি।

আমাদের দেশে যে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বাস, তারা আদিবাসী দিবস পালন করছে। তারা কিন্তু আমাদের এই ভূখণ্ডে আদিবাসী নয়। তারা অভিবাসী। আমাদের এই ভূখণ্ডে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা অভিবাসী হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সংস্থাগুলো আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আইন আদিবাসী শনাক্ত করার জন্য যে বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করেছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১. আদিবাসীরা সাধারণত তাদের পূর্ব পুরুষদের বাসভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বংশানুক্রমে বসবাস করে এবং

২. তারা তাদের এলাকাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধারণ করে ও মেনে চলে।

বাংলাদেশ সরকার এদেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর জনগণকে আদিবাসী নয় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়ে সরকার ২০১১ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। ২০১১ সালের ২১শে জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আদিবাসী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এই বলে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী নয়। বরং বাংলাদেশের জনগণের সকলেই বাংলাদেশে আদি এবং প্রাচীন ভূ-খণ্ডে বসবাসরত শ্বাশতকাল ধরে বসবাস করার সুবাদে এদেশের আদিবাসী। বাঙালি একটি মিশ্রিত বা শংকর জাতি এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম। জাতিতাত্ত্বিক নৃবিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে ৪টি প্রধান জনগোষ্ঠী রয়েছে– নিগ্রীয়, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয়। এই ৪টি নরগোষ্ঠীর প্রতিটির কোনো না কোনো শাখার আগমন ঘটেছে বাংলায়। হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদেশে বাঙালিরা 'মূল আদিবাসী' বলে গবেষকরা মনে করেন। ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ একটি গাঙ্গেয় বদ্বীপ। এটি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অংশ। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত আদিবাসীদের অ্যাবোরিজিন বা ইন্ডিজিনাস পিপল বলা হয়। যারা কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা এবং ক্যাপ্টেন জেমস কুক কর্তৃক অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার হওয়ার পূর্বেই সেখানে বসবাস করে আসছিল। এক অর্থে বাংলাদেশে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিজেদের আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দেয়, তারা মূলত এদেশে আগত অভিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের 'আদিবাসী'। তাঁরা প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে এদেশে বসবাস করছে আর ঐতিহাসিক তথ্য মতে, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আগমন ঘটেছে ১৭২৭ সাল থেকে। তারা এ অঞ্চলে অভিবাসী হিসেবে বসবাস করে আসছে। সঙ্গত কারণে তারা 'আদিবাসী' নয়। প্রয়াত রোসাং সার্কেলের চিফ তথা রোসাং রাজা অং শু প্রু চৌধুরী ৯৬ বছর বয়সে স্বীকার করেছেন তারা 'আদিবাসী' নয় বরং প্রায় তিনশ বছর ধরে এদেশে বসবাস করে আসছেন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার সর্ববৃহৎ চাকমা সম্প্রদায়ের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে। নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে, চাকমারা বাহির থেকে এসে তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক অভিমত অনুযায়ী চাকমারা মূলত মধ্য মিয়ানমার ও আরাকান এলাকার আদিবাসী। ময়মনসিংহ বিভাগে বসবাসরত গারো সম্প্রদায় চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সিলচিয়াং প্রদেশ থেকে এসেছে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, গারোরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর তিব্বতী বর্মণ শাখার বোড়ো উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত মণিপুরিদের আদি বাসস্থল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত সাঁওতালদের আদি নিবাস রাঢ়। বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং পরবর্তীতে ভারতের সাঁওতাল পরগনায়।

বাংলাদেশের কক্সবাজার ও পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে বসবাসরত রাখাইনদের আদি নিবাস মিয়ানমারের রোসাং বা রোসাংগিরি রাজ্য। এভাবেই লক্ষণীয় যে বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বাস, তারা বিভিন্ন সময়ে অন্যস্থান থেকে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালি জাতির বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। সেই হিসাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণ এদেশে অভিবাসী। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে যে বিবৃতি প্রকাশ করে, তা বাংলাদেশে আদিবাসী প্রসঙ্গ নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ছড়ানো ভুল ধারণা নিরসনের লক্ষ্যে যথার্থ। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী জাতিসংঘ 'আদিবাসী' (Indigenous people) ও উপজাতি (Tribal people) এই দুই পরিভাষার সংজ্ঞা প্রদান করেছে। সেখানে 'আদিবাসী' তাদেরই বলা হয় যারা বংশানুক্রমে কোনো ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের আগে থেকেই বসবাস করে আসছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ঐতিহাসিক দলিল *হিল ট্রাক্টস অ্যাক্ট অব 1900* এবং ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টারের *সেনসাস অব ইন্ডিয়া*তেও এ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে উপজাতি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, 'আদিবাসী' নয়। ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানেও তাদের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) উপজাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সকল বিচারের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯ ভাগ বাঙালিরাই বাংলাদেশের 'আদিবাসী'।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বসবাস। পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে ১২টি উপজাতি। বাকিরা বসবাস করছে সিলেট, ময়মনসিংহ ও রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে। বিভিন্ন সূত্রমতে অধিকাংশ উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বিশাল জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। চাকমাদের মধ্যে খ্রিষ্টান হওয়ার সংখ্যা কম হলেও মারমা, গারো, কোল, লুসাই, পাংখো, মণিপুরি ও সাঁওতালদের বড়ো একটি অংশ খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতীয় অংশের অবস্থানও অনুরূপ। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তথা মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিরা অনেকেই খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় ইতোমধ্যে তারা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। গবেষকদের মতে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল এবং মিয়ানমারের নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে ভারত বাংলাদেশের এই পার্বত্যাঞ্চল ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু বিদেশি নানা চক্র পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতীয়দের আদিবাসী স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে খ্রিষ্টান রাষ্ট্র গঠনের তৎপরতা চালাতে পারে। সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হলে বিদেশি চক্রের সমর্থন নিয়ে সরকারের ওপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি পার্বত্য জেলাগুলো থেকে বাঙালিদের উচ্ছেদ এবং পার্বত্যাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় পথ সুগম করবে। পরবর্তীতে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনে যে তৎপর হবে না– তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বাংলাদেশে 'আদিবাসী' বির্তক অতিসম্প্রতি চালু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাবোরিজিন, যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিয়ান, নিউজিল্যান্ডের মাউরি, দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকা ও মায়া, জাপানের আইনু, রাশিয়ার মেন্ডে, ফ্রান্স ও স্পেনের বাসকু ও আরব দেশের বেদুইন প্রভৃতি জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ভারতে নৃগোষ্ঠী ও উপজাতীয়দের তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী বলে স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল জাতিসত্তাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইনডিজেনাস অ্যাক্ট ট্রাইবাল পপুলেশনস কনভেনশন– ১৯৫৭ (নং ১০৭) সালে পাস হলেও এ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২৭টি দেশ এটি রেটিফাই করেছে। ১৯৭২ সালে ২২শে জুন বাংলাদেশও রেটিফাই করেছিল। পরে কনভেনশন ১৬৯ পাস করার পর পূর্বোক্ত কনভেনশন ১০৭ তামাদি হয়ে যায়। বাংলাদেশ কনভেনশন ১৬৯ রেটিফাই করেনি। এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর 'আদিবাসী দিবস' পালন করার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। ইনডিজেনাস অ্যাক্ট ট্রাইবাল পপুলেশন কনভেনশন ১৯৮৯ (নং ১৬৯) পাস হলেও এ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র ২২টি দেশ এ কনভেনশন রেটিফাই করেছে। এই এশিয়া মহাদেশের একমাত্র নেপাল ছাড়া কোনো দেশ এই কনভেনশন রেটিফাই করেনি। ২০০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৬১তম অধিবেশনে আদিবাসী বিষয়ক যে ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়, তাতে ভোটদানে বিরত থাকে ১৪৩টি দেশ। প্রস্তাবের পক্ষে ৪টি দেশ, বিপক্ষে ১১টি দেশ। এর মধ্যে ৩৪টি দেশ অনুপস্থিত থাকে। ভোটদানে বিরতদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

প্রখ্যাত উপজাতি গবেষক ও নৃতাত্ত্বিক রবার্ট হেনরি হাচিনসনের বই *অ্যান একাউন্ট অব চিটাগাং হিল ট্রাক্টস* (১৯০৬), ক্যাপ্টেন থমাস হার্বাট লেউইন (১৮৬৯) লেখা বই *দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস অ্যান্ড ডুয়েলার্স দেয়ার ইন* (১৮৬৯), অমরেন্দ্র লাল খিসা প্রমুখের লেখা গবেষণাপত্র, থিসিস এবং রিপোর্ট বিশ্লেষণে এই প্রমাণ মেলে যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো এদেশের আদিবাসী বা ভূমিপুত্র নয়। তারা অভিবাসী।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

৩৮০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ

দেশের ৪৭০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৩৮০টি উপজেলায় সর্বমোট ৮৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে ৬৩টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণও সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৩৬ কোটি টাকা প্রায়। এছাড়া ঢাকা জেলা এবং আরো ৩০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ২৮শে জুলাই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এসব তথ্য জানানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো জাতীয় চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত। যথাযথ মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভায় আরো জানানো হয়, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) বরাদ্দের শতকরা ৮৪.৯১ ভাগ অর্থ ব্যয় করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে ৩৮০টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ৮৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে। এছাড়া ২৭২টি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনা সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ এবং ৬৫টি স্মৃতিস্তম্ভ ও জাদুঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ১১৫টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদন: আরেফিন অনু

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প

মো. খালিদ হোসেন

পর্যটন (Tourism) বলতে এক ধরনের বিনোদন, অবসর অথবা ব্যাবসায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থান কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করাকে বোঝায়। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী অবসরকালীন কর্মকাণ্ডের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পর্যটনশিল্প জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যিনি আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র ভ্রমণ করেন তিনি পর্যটক নামে পরিচিত। ট্যুরিস্ট গাইড, পর্যটন সংস্থা প্রমুখ সেবা খাত পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই জড়িত রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী পর্যটনশিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা ২০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আর বিপুলসংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। ২০১৮ সালে এ শিল্প থেকে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রেখেছে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ (সূত্র: WTTC)।

পর্যটনে অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ লাখ পর্যটক দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ভ্রমণ করে থাকেন। ২০১২-২০১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লাখ, যা ২০০০ সালের দিকে ছিল ৩ থেকে ৫ লাখ। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে ভ্রমণপিপাসা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখছে পর্যটনশিল্প। বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এছাড়া পরোক্ষভাবে রয়েছে ২৩ লাখ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্থানসমূহ নিম্নরূপ

শহিদমিনার

ভাষা শহিদদের স্মৃতিস্মরণে নির্মাণ করা হয় শহিদমিনার। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গণে এটি অবস্থিত। ১৯৫২ সালে তৈরি করা হয় প্রথম শহিদমিনার, যা পাকিস্তান সরকার ভেঙে ফেলে। ১৯৭২ সালে শহিদমিনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৪ মিটার (৪৬ ফুট) উচ্চতার বর্তমান শহিদমিনারে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে হাজার হাজার মানুষ ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এটি ঢাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স

কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান মুজিবনগর) বাংলাদেশের প্রথম সরকার (যা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) শপথ গ্রহণ করে, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখানে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। প্রায় ৮০ একর জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। এটি বর্তমানে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে নির্মিত হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি একটি স্মারক স্থাপনা এবং পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের ভিড়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত। প্রতিদিন দর্শনার্থী ও বিদেশি পর্যটকরা সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে এসে ভিড় করে এবং শ্রদ্ধা জানান।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত হচ্ছে কক্সবাজার। উল্লেখ্য, ক্যাপ্টেন হিরেম কক্স-এর নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় কক্সবাজার। ১২০ কিমি. লম্বা এই সমুদ্রসৈকতের পুরোটাই বালুকাময় যেখানে শামুক, ঝিনুকের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। নানা প্রজাতির প্রবালসমৃদ্ধ বিপণিবিতান, অত্যাধুনিক হোটেল, মোটেল, কটেজ, বার্মিজ মার্কেট ইত্যাদি স্থানসমূহ পর্যটকদের পদচারণায় মুখরিত থাকে। সমুদ্রসৈকতের প্রবেশমুখে কক্সবাজার জেলা পরিষদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় দৃষ্টিনন্দন 'বিচ গার্ডেন কাম পার্ক' ও ২৬টি দোকানসমৃদ্ধ ঝিনুক মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য পর্যটক কক্সবাজারে ভ্রমণে আসে।

সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ

সেন্টমার্টিন্স দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক শৈবাল, গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, সামুদ্রিক মাছ, উভচর প্রাণী ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়। দ্বীপটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র।

মহাস্থানগড়

ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পুরাকীর্তিটি বগুড়ায় অবস্থিত। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়। মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং সেন আমলেও বগুড়ার বিশেষ প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে এটি অবস্থিত। এটি পর্যটকদের জন্যও দর্শনীয় স্থান।

জাফলং

সিলেট নগরী থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলায় এর অবস্থান। খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সীমান্তের ওপারে ডাউকি পাহাড় থেকে আসা

সুন্দরবন

পিয়াইন নদীর প্রবাহে সৃষ্ট ঝর্ণাধারা জাফলংকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ এক লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। রূপকন্যা হিসেবে সারা দেশে এক নামে পরিচিত সিলেটের জাফলং।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জীববৈচিত্র্যে ভরপুর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বা গরান বনভূমি সুন্দরবন অন্যতম প্রধান পর্যটন অঞ্চল। এই বনভূমি গঙ্গা ও রূপসা নদীর মোহনায় অবস্থিত সমুদ্র উপকূল তথা বাংলাদেশ ও ভারতে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করে। ধারণা করা হয়, সুন্দরী গাছের নামানুসারেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে। এই বনে সুন্দরী গাছ ছাড়াও গেওয়া, কেওড়া, বাইন, পশুর, গরান ও গোলপাতা গাছ রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। বাংলাদেশের জাতীয় পশু বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ এই বনে ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪০০ প্রজাতির মাছ, ২৭০ প্রজাতির পাখি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৩৩০ প্রজাতির গাছ রয়েছে। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্পট হলো– হিরণ পয়েন্ট ও কটকা। পুরো সুন্দরবনজুড়ে রয়েছে অসংখ্য খাল। এসকল খালের মধ্যে দিয়ে ইঞ্জিন বোট বা নৌযানে যাওয়ার পথে অনেক সময় ডাঙায় কুমিরকে রোদ পোহাতে দেখা যায়। পৃথিবীতে মোট ৩টি ম্যানগ্রোভ বনের মধ্যে সুন্দরবন সর্ববৃহৎ। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আবহমানকাল ধরে আর্কষণ করে আসছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

ষাট গম্বুজ মসজিদ বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৪৪ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ২৭ মিটার। বাংলাদেশের মধ্যে ইট ও চুন সুরকি দ্বারা নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ সর্ববৃহৎ। ষাটটি স্তম্ভ বা পাথরের খামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিধায় হয়ত এটির নামকরণ করা হয়েছে ষাট গম্বুজ। মসজিদটিতে অর্ধগোলাকার মোট ১০টি মেহরাব রয়েছে। এই মসজিদটি খান জাহান আলী (র.)'র নির্মাণকৃত সকল স্থাপত্যকর্মের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। ধারণা করা হয়, এই মসজিদটি তিনি ১৪৫০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদটির অলংকরণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলক ও ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ষাট গম্বুজ মসজিদটি ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত

দেশের সর্ব দক্ষিণে পটুয়াখালী জেলায় কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত সাগরকন্যা নামে খ্যাত কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। ১৮ কিমি. দীর্ঘ এবং ৩ কিমি. প্রশস্ত এই সমুদ্রসৈকত কলাপাড়া শহর থেকে ২২ কিমি. দূরে অবস্থিত। এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বিশাল সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। কুয়াকাটার সাগরের পানিতে কক্সবাজারের তুলনায় লবণের পরিমাণ কম। এখানে মাঝে মাঝে সাদা গাঙচিল এবং কখনো পরিযায়ী পাখির দেখা পাওয়া যায়। সম্প্রতি এখানে বেসরকারি উদ্যোগে একটি সি-ফিশ মিউজিয়াম স্থাপিত হয়েছে। এতে অন্তত ১৩০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে টাইগার হাঙর, অক্টোপাস হাঙর, জেলি ফিশ, বাদুড় মাছ, সজারু মাছ, টুনা মাছ ও সামুদ্রিক কাঁকড়া অন্যতম। কুয়াকাটা অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম লীলাভূমি। সুবিস্তৃত সৈকত আর বালিয়াড়ির বুকে দাঁড়িয়ে একমাত্র কুয়াকাটা থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়ই উপভোগ করা যায়। মূলত এ কারণেই প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অগণিত পর্যটক আগমন করে থাকেন সাগরকন্যা কুয়াকাটায়।

পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত

দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণে কর্ণফুলি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত অবস্থিত। চট্টগ্রাম শহর থেকে এই সৈকতের দূরত্ব প্রায় ২০ কিমি.। চট্টগ্রাম শহর থেকে পতেঙ্গা যাওয়ার পথে অনেক বড়ো বড়ো কারখানা, মেরিন একাডেমি ও কর্ণফুলি নদী চোখে পড়ে। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঘাঁটি বিএনএস ঈসা খান পতেঙ্গার সন্নিকটে অবস্থিত। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক জেটি এখানে রয়েছে। মোহনা এলাকায় কর্ণফুলি নদী আর বঙ্গোপসাগরের পানির পার্থক্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। এখান থেকে রাতের বেলা কর্ণফুলির পাড়ে নেভাল একাডেমি সংলগ্ন বিচ থেকে মোহনার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

ফয়'স লেক

চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র থেকে ৮ কিমি. দূরে পাহাড়তলি রেল স্টেশনের অদূরে খুলশি এলাকায় অবস্থিত কৃত্রিম হ্রদটি ফয়'স লেক নামে পরিচিত। এটি ১৯২৪ সালে আসাম বেঙ্গলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে খনন করা হয় এবং সে সময় এটি পাহাড়তলি লেক হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ইংরেজ রেল প্রকৌশলী ফয় (Foy)-এর নামে নামকরণ করা হয়। ৩৩৬ একর জমির উপর এই হ্রদটি পাহাড়ের এক শীর্ষ থেকে আরেক শীর্ষের মধ্যবর্তী একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সৃষ্ট। ফয়'স লেকের পাশেই রয়েছে চট্টগ্রাম শহরের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'বাটালি হিল'।

এছাড়া বাংলাদেশের আরো কিছু পর্যটন স্থান রয়েছে। যেমন– আহসান মঞ্জিল, শহিদমিনার, জাতীয় সংসদ ভবন, সোমপুর বৌদ্ধবিহার বা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, বাঘা মসজিদ, রামসাগর, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত প্রভৃতি।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে পর্যটনশিল্পের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে বর্তমান সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যটন খাতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩৪ কোটি টাকা– যা এ খাতকে আরো উন্নত ও গতি সঞ্চার করবে।

লেখক: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

কাশফুল: শরতের আগমনি বার্তা

হামিদা খাতুন

বর্ষার পরেই আসে শরৎ। শরৎ ক্ষণস্থায়ী ঋতু। 'ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া' তার আবির্ভাব। ভাদ্র-আশ্বিন মিলে শরৎকাল হলেও আশ্বিনের শুরু থেকেই সোনা রোদ দেখা যায়। আবার আশ্বিন শেষ না হতেই সে রোদ মিলিয়ে যায়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এ ঋতু তার স্বল্প সময়ে প্রকৃতিকে আশ্চর্য রূপলাবণ্যে ভরে তোলে। তাই তখন কবিও গেয়ে ওঠেন–

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।

শরৎকালে বনে-উপবনে শিউলি, গোলাপ, বকুল, মল্লিকা, কামিনী, মাধবী প্রভৃতি ফুল ফোটে। বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা আর নদীর ধারে কাশফুল। এসময়ে তালগাছে তাল পাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজাও এসময় অনুষ্ঠিত হয়। শরৎকালই বর্ষার সৌন্দর্যকে সাদরে গ্রহণ করে অপরূপ সাজে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। দিনের বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রোদে গ্রামবাংলার মাঠঘাট, নদীনালা, জলাশয় ঝলমল করে। শরতের এমন ভোলানো রূপ সত্যিই অতুলনীয়। বাংলাদেশের ঋতু পরিক্রমায় শরৎকালের আছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফুল, ফল আর ফসলের দেশ বাংলাদেশের এই ঋতু সবার মনেই আনন্দের সঞ্চার করে। তাই শরতের আবেদন প্রতিটি মানুষের কাছে অপূরণীয়। দেশের মাটি আর মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে শরৎকাল।

শরতের ভোরবেলার সৌন্দর্য অতুলনীয়। হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির শরৎ প্রভাতের প্রথম স্নিগ্ধ উপহার। ভোর হতে না হতেই শিশির বিন্দু ও শিউলি ফুল ঝড়ে পড়ে সবুজ ঘাসে। এর ওপর যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন মনে হয় চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র মুক্তদানা। শরৎকালের আকাশ গাঢ় নীলিমার অবারিত বিস্তার। ক্ষান্ত বর্ষণ স্বপ্নীল আকাশের পটভূমিকায় জলহারা লঘুভার মেঘপুঞ্জ। ধীর মন্থর ছন্দে তার কেবলই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা। দিকে দিকে তার প্রসন্ন হাসির নম্র আভা ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির বুকে। এমনি করে সকাল পেরিয়ে গড়িয়ে আসে শরৎ দুপুর। শরৎ দুপুরের আলোয় ঘাস, ধান, বাঁশঝাড়, খড়ের চালে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো শুকিয়ে যায়। গাছে গাছে পত্রপল্লবে সবুজের ছড়াছড়ি। গাছে গাছে, ডালে ডালে দোয়েল, পাপিয়ার প্রাণ মাতানো সুর মূর্ছনা। তখন নীরবে পাখা মেলে উড়ে সাদাচিল। মেঘের কাছাকাছি ডানা মেলে ঈগল। আসলেই শরতের দুপুর বড়োই নির্মল। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হয় তখন এর রূপ আরো মায়াবী মনে হয়। রোদ তার তেজ কমিয়ে নিজেকে অনেকটা শীতল করে নেয়। সবুজ গাছগাছালি রোদ পেয়ে বেশ তাজা হয়ে ওঠে।

শরৎকাল স্বপ্নের মতো মায়াবী আর ছবির মতো ঝকঝকে। শরৎ তাই সুন্দরের ডালা সাজিয়ে আমাদের প্রকৃতিকে উদার হাতে সাজায়। কাশবন সেই দৃশ্যের কোমল ছবি। কাশবনে উড়ে যায় নীল, লাল, বেগুনি, হলুদ আর কালো ধূসর রঙের প্রজাপতি। শরৎ পাখির পাখায় কম্পন জাগায়। ফুলের মাঝে আনে স্পন্দন। এ সময় বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কাশবনে ছুটে আসে মৌমাছি। রূপে-গুণে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না বলেই শরৎ রূপের রানি। নদীর ধারে, কাশের বনে, বাতাসের দোলায়, শরতের আগমন যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরো সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে তোলে। তাই প্রকৃতিতে যখন শরৎ আসে তখন কাশফুলই জানিয়ে দেয় শরতের আগমনি বার্তা। শরতের বিকেলে নীল আকাশের নিচে দোল খায় শুভ্র কাশফুল। কাশফুল মূলত এক ধরনের ঘাস জাতীয় ফুল। এ ফুলের ডাটা অনেক লম্বা হয়। ডালের মধ্যে অনেক শাখা থাকে। এই শাখাগুলো যখন পূর্ণ হয় তখনি ফুল ফোটে। কাশফুল দুই ধরনের হয়। যেমন: পাহাড়ি কাশফুল, অন্যটি চর অঞ্চলের কাশফুল। পালকের মতো নরম কাশফুল সাদা রঙের হয়ে থাকে। এই ফুল মনের মধ্যে এক শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। আর তখনি কবির হৃদয় থেকে কবিতা-গান বেরিয়ে আসে।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমার গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজায়ে এনেছি বরণডালা।

শরৎকালে মানুষের মনে লাগে উৎসবের রং। তখন বাঙালির হৃদয়মন আসন্ন উৎসবের আনন্দ জোয়ারে প্লাবিত হয়। বাঙালির মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় উৎসব দুর্গাপূজার আয়োজনে মুখর হয় বাংলার গ্রাম-নগর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শরৎ ঋতুর রয়েছে এক অপরিহার্য ভূমিকা। শরৎ ফসলের ঋতু নয় বটে, তবে আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণী-ই সে বহন করে আনে। পাকা ধানের ডগায় সোনালি রোদ গলে গলে পড়ে। তখন কৃষকের চোখ আনন্দে ভরে ওঠে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের ক্ষেত দেখে কৃষক আশায় বুক বাঁধে। এর ওপর বাংলাদেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব রচিত হয়। তাই কৃষিনির্ভর শরৎ কেবলই অফুরন্ত স্নিগ্ধ-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যের ঋতুই নয় বরং নানা ক্ষেত্রেই এ ঋতুর অবদান রয়েছে। তবে এ ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সাদা রঙের কাশফুল, যা শরতের চির চেনা রূপ। তাই কাশফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আমাদের শরতের কাছে যেতেই হবে। পরিশেষে বলতে হয় কাশফুলই জানান দেয় শরতের আগমনি বার্তা।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারী

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ রোল মডেল

সুস্মিতা চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে দিয়েছেন। আর সে পথেই হেঁটেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের নারীরা প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তা, সাহসী পদক্ষেপ থেকে সাহস পেয়ে আজ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। 'ও বোন' নামে মোবাইল অ্যাপভিত্তিক পরিবহণ সেবা থেকে শুরু করে বিমান বাংলাদেশ পরিবহণ ড্রিমলাইনার 'আকাশবীণা' উড়িয়ে হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছেন নারীরা। বর্তমানে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সব খাতে সরব উপস্থিতি নারীদের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী সিদ্ধান্তে এক দশকে নারীর ক্ষমতায়নে বহির্বিশ্বে ঈর্ষণীয় অবস্থান বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার সংবিধানের ১৯(৩) ও ২৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও গণ-জীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে অর্জন ও সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

২. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করেছে। রাজনীতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও উপজেলা পরিষদে এবং পৌরসভায় সংরক্ষিত নারীর আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. পরিবারে নারীর সমতা বিধানের জন্য যৌতুক প্রতিরোধে 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০তম।

৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন এবং বাল্যবিবাহ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. আপিল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ, বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো নারী উপাচার্য নিয়োগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য পদেও একজন নারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য হিসেবে প্রথমবারের মতো একজন নারী ডাক্তারকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৬. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ পাস এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ কার্যকর করা হয়েছে।

৭. মাতৃসূত্রে নাগরিক হওয়ার বিধানসহ নাগরিক আইন সংশোধন করা হয়েছে।

৮. প্রধানমন্ত্রীসহ ৪ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা ও সংসদ উপনেতা, একজন নারী হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দুজন নারী সভাপতি নিযুক্ত রয়েছেন। জাতীয় সংসদে মোট সংসদ সদস্যের ২০ শতাংশ নারী। বর্তমানে মোট নারী সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৭২ জন।

৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

১০. বাজেটে নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য প্রথমবারের মতো ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিক শিল্প নগরীতে ১০ শতাংশ প্লট বাধ্যতামূলক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১. গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদের সুবিধায় আশুলিয়া ও সাভারে ১৬ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২. বর্তমান সরকারের উদ্যোগের ফলে প্রতি উপজেলায় সরাসরি ভোটে নারী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হচ্ছেন। প্রথমবারের মতো বিজিবিতে নারী সদস্য নিয়োগ শুরু হয়েছে।

১৩. পুলিশ, সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ফোর্সে নারী পুলিশ ইউনিটের অংশগ্রহণ এবং নারীদের জন্য আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

১৪. হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে নারী বিচারপতি নিয়োগসহ নির্বাচন কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার পদে নারীদের পদায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও নারী সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে।

১৫. মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস করা হয়েছে।

১৬. ১৯৯৬ সাল থেকে বাবার নামের পাশাপাশি পাসপোর্টসহ সকল ক্ষেত্রে মায়ের নামের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৭. নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনো জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৮. সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৯. এছাড়া ব্যাবসায় সমান সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

২০. দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকার বাস্তবমুখী প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রভৃতি।

২১. প্রান্তিক নারীদের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াতের খরচও সরকার বহন করছে। এতে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার এখন প্রতি লাখে ১৭০ জনে নেমে এসেছে।

২২. বর্তমানে প্রশাসনের উচ্চপদে ৬০০ জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব পদে নয় জন নারী কর্মরত রয়েছেন।

২৩. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১।

২৪. মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তায় শিশু আইন ২০১৩ প্রণীত হয়েছে।

২৫. হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৬. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং সাতটি বিভাগে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার খোলা হয়েছে।

২৭. বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর হার ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ। সরকার বিনামূল্যে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সি সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যার ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতে মেয়েদের দেওয়া হচ্ছে বৃত্তি।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানের জন্য ২০১৯ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁকে 'লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'–এ ভূষিত করে 'ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন'। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ অবদান রাখার জন্য 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন। নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং ব্যাবসায়িক উদ্যোগে ভূমিকার জন্য 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড

বৈশ্বিক করোনা মহামারির মধ্যেই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে এই বন্দর দিয়ে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৭২ হাজার একক কনটেইনার; যা বিগত ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

করোনা মহামারির সময়ে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করে গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর প্রথম সহসভাপতি আবদুস সালাম বলেন, 'কারখানা খোলার ব্যাপারে সরকারের সঠিক, চ্যালেঞ্জিং এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই আমরা রপ্তানিতে বড়ো সুফল পাচ্ছি। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা, নীতিগত সহায়তা এবং শ্রমিকদের কাজে যোগ দেওয়ার আন্তরিকতাও প্রশংসা করার মতো। তখন যদি কারখানা না খুলত, তাহলে এই সেক্টরের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকত কল্পনাই করতে পারতাম না।' উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য উঠানামার চিত্র থেকে দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রমাণ মিলে। অর্থনীতির লাইফলাইন চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির ৮২ শতাংশ আসে; আর রপ্তানি পণ্যের ৯১ শতাংশই যায় এই বন্দর দিয়ে।

প্রতিবেদন: পি আর শ্রেয়সী শ্যামা

রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ

সৈকত নন্দী সৌখিন

চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুরুতেই জুলাই মাসে এসে রপ্তানি বাণিজ্যে ঘুরে দাঁড়ালো বাংলাদেশ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ৪ঠা আগস্ট ২০২০ রপ্তানি আয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতির হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। রপ্তানি আয়ের যে তথ্য ইপিবি প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৩৯১ কোটি ৯ লক্ষ ২০ হাজার (৩.৯১ বিলিয়ন) ডলার আয় হয়েছে। গত বছরে জুলাইয়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ০.৫৯ শতাংশ। গত অর্থবছরের জুলাই মাসে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৩৮৮ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এই অর্থবছরের জুলাই মাসে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৪৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার। ২০২০ সালের জুলাইয়ে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ বেশি। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধিতে ফিরে এসেছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস মহামারিতে বিশ্বের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ায় এপ্রিলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় নিম্নমুখী ছিল। তবে বিধিনিষেধ শিথিলে কারখানা খোলার পর মে মাসে রপ্তানি আয় কিছুটা বাড়ে, জুনে তারচেয়ে আরো বেশি বাড়ে, আর নতুন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ যে আয় করেছে, তা গত ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের যে-কোনো মাসের চেয়ে বেশি।

চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৮ বিলিয়ন (৪ হাজার ৮০০ কোটি) মার্কিন ডলারের পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে সরকার, যা গত অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের চেয়ে ১৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি। এই অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি করে ৪১ বিলিয়ন ডলার ও সেবা খাতে ৭ বিলিয়ন ডলার আয়ের প্রত্যাশা করছে সরকার। উল্লেখ্য যে, গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ৪০ লাখ (৩৩.৬৭ বিলিয়ন) ডলার আয় করে।

২০২০ সালের জুলাই মাসে তৈরি পোশাকে রপ্তানি আয় এসেছে ৩২৪ কোটি ডলার। এছাড়া, কৃষি, পাট, রসায়ন ও প্রকৌশলসহ অধিকাংশ খাতে পণ্য রপ্তানি আয় বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ জুলাই মাসে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩২৪ কোটি ৪৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। অর্থাৎ মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশই এসেছে পোশাক খাত থেকে। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৮৪ কোটি ২০ লাখ ৬০ হাজার ডলার। সে হিসাবে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৪.১৮ শতাংশ।

জুলাই মাসে নিট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৭৫ কোটি ২ লাখ ডলারের। নিট পোশাকে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ৪ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেড়েছে ২৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ। ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১৪৯ কোটি ৪৬ লাখ ডলার। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেড়েছে ৪ শতাংশ। নিট পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ'র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম রপ্তানি আয়ে উল্লম্ফনে খুশি হলেও সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গণমাধ্যমকে বলেন, এটা খুবই আশাব্যঞ্জক এবং ভালো খবর আমাদের জন্য। এই কঠিন সময়েও প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলারের মতো রপ্তানি আয় দেশে এসেছে।

হোম টেক্সটাইল খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৯ কোটি ৪০ লাখ ১০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ কোটি ৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা থেকে রপ্তানি বেশি হয়েছে ১৬. ৪১ শতাংশ।

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৭৬ কোটি ৭৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩১ কোটি ৭ লাখ ডলার। যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১৩.৭৯ শতাংশর বেশি আয় হয়েছে।

কেমিক্যাল পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ২ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ কোটি ৬ লাখ ১০ হাজার ডলার। রপ্তানি আয় বেড়েছে ১১.৫ শতাংশ।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৮ কোটি ৯৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ কোটি ৭৩ লাখ ৯০ হাজার ডলার। সে হিসাবে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৬. ২২ শতাংশ।

নতুন অর্থবছরের প্রথম মাসেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়। কৃষিপণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ১০ কোটি ১০ লাখ ৬০ হাজার ডলার। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯ কোটি ১০ হাজার ডলার। সে হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা থেকে রপ্তানি বেড়েছে ১২.২৮ শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রথম মাসে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে পাট রপ্তানিতে। জুলাই মাসে ১০ কোটি ৩৫ লাখ ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৭ কোটি ৪৮ লাখ ডলার। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ। জুলাইয়ে হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৩ কোটি ১৭ ডলার আয় করেছে। এছাড়া ওষুধ রপ্তানিতে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. জাফর উদ্দিন বলেন, করোনা সংকটে দেশের রপ্তানি আয় নিয়ে যে ধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, জুলাইয়ের আয় আমাদের সে শঙ্কা অনেকটা দূর করে দিয়েছে। করোনা পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশের ওষুধ, হালকা প্রকৌশল ও কৃষিজাত পণ্যের মতো অপ্রচলিত পণ্য খুব ভালো করছে। রপ্তানি খাতে বৈচিত্র্য বাড়াতে এসব পণ্যের বিপরীতে নীতিনির্ধারণী সহায়তা দেওয়ার বিষয়েও আমাদের সুপারিশ রয়েছে। অর্থাৎ অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেশের রপ্তানি খাত করোনার সংকট কেটে নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক ধারায় ফিরছে। এই ভালো খবর আমাদেরকে স্বস্তি দিয়েছে। আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই রপ্তানি খাতের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকুক –এই কামনা করি।

লেখক : ব্যাংকার ও প্রাবন্ধিক

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল রিভিউ ২০২০' প্রতিবেদনে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ– এ তথ্য উঠে এসেছে। বরাবরের মতো প্রথম স্থানে রয়েছে চীন। আর বাংলাদেশ থেকে একধাপ নিচে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম।

পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে মূলত ২৭টি দেশের জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। কিন্তু একক দেশ হিসাব করলে দ্বিতীয় বাংলাদেশ। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, একক দেশ হিসেবে ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে চীন। তবে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে দেশটির পোশাক রপ্তানি ৬০০ কোটি ডলার কমে ১৫ হাজার ২০০ কোটি ডলার হয়েছে। বাজারে তাদের অংশীদারিত্ব ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ। গত বছর বাংলাদেশ তিন হাজার ৪০০ কোটি ডলারের (প্রকৃত পক্ষে তিন হাজার ৩০৭ কোটি ডলার) পোশাক রপ্তানি করেছে।

প্রতিবেদন: সাবিহা শিমুল

সিডও দিবস ও বাংলাদেশের নারী

মো. শহিদুল ইসলাম

নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ হলো সিডও (CEDAW)। সিডও হলো একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দলিল। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জাতিসংঘ সনদ। ইংরেজিতে (Convention on the Elimination of the forms of Discrimination Against Women), সংক্ষেপে CEDAW হিসেবে পরিচিত। বাংলায় এটিকে চিহ্নিত করা হয় 'নারীর প্রতি সব বৈষম্য বিলোপ সনদ' (সিডও)। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক সনদটি গৃহীত হলেও ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে তা কার্যকর করা শুরু হয়। আর সে কারণেই ৩রা সেপ্টেম্বর 'সিডও দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সনদকে 'ইউমেনস বিল অব রাইটস'ও বলা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ৬০টির অধিক সনদ বা চুক্তির মধ্যে ৭টি সনদকে মৌলিক বা মানবাধিকার চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এর মধ্যে সিডও সনদ অন্যতম।

সিডও কনভেনশন বা দলিলের মূল মর্মবাণী হলো– সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে সেই ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি এবং সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন করা। এই সনদে স্বাক্ষরকারী জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো এই সনদের ধারাগুলো নিজ নিজ দেশে কার্যকর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এজন্য আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার, আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন, সনদে শরিক রাষ্ট্রগুলো তার সকল ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ১৯৮০ সালে সিডও সনদে স্বাক্ষর শুরু করে। বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। এই স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ 'সিডও সনদ' বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সনদের মূল বিষয় হচ্ছে– নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ বা দূরীকরণ, যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক সব ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এটি আইনগত ভিত্তি নিয়ে একটি কনভেনশন আকারে রূপ লাভ করেছে। এ সনদটি মূলত তিনটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়। ক. নারীর নাগরিক অধিকার ও আইন সমতা নিশ্চিতকরণ, যার মাধ্যমে নারী জনজীবনে ও সমাজে পুরুষের সমপর্যায়ে সব সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। খ. নারীর প্রজনন ভূমিকাকে সামাজিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা, যাতে প্রজননের কারণে নারীকে কোণঠাসা না করে বরং এক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গ. আচার-প্রথা, সংস্কার ও বিধি যা নারীর জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে, তা বাতিল করা এবং পরিবার ও সমাজে শুধু 'মানুষ' হিসেবে নারীকে গণ্য করা এবং পুরুষের সমতাভিত্তিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কনভেনশনের শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নারীর শোষণ রোধ নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক ও লোকজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান; জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা বহাল রাখার সমান অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। নারীর নিজ নিজ দেশে রাজনৈতিক ও লোকজীবনে অংশগ্রহণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল কাজ করার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে কনভেনশনে।

সিডও'র তিনটি মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদে রচিত হয়েছে ৩০টি ধারা। নীতি তিনটি হলো– ১. সমতার নীতি; ২. বৈষম্যহীনতার নীতি এবং ৩. শরিক রাষ্ট্রগুলোর দায়বদ্ধতার নীতি। সনদের ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত ধারাগুলোতে ঘোষিত হয়েছে নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগুলো। ১৭ থেকে ২২ ধারায় বর্ণিত হয়েছে সিডও'র কর্মপন্থা ও শরিক রাষ্ট্রগুলোর দায়বদ্ধতা পালনের পন্থাগুলো। ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডও'র প্রশাসন সংক্রান্ত।

১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার সিডও সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও তখন সিডও'র ১৬টি ধারার মধ্যে ৪টি ধারা বাদ রেখে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সিডও'র পূর্ণ অনুমোদন দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে ৪টির মধ্যে ২টি ধারা থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেন।

এই সনদের ১নং ধারায় নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে কী বোঝায় তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এটিই প্রথম কোনো একটি জাতিসংঘ সনদ যেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। নারী-পুরুষ ভিত্তিক যে-কোনো পার্থক্য, বঞ্চনা বা নারীর ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হলেই তাকে বৈষম্য বলে গণ্য করা হবে। নারীর মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা কোনো অবস্থায় ক্ষুণ্ন করা যাবে না। সিডও সনদে এটাও বলা হয়েছে যে, কোনো ঐতিহ্য, ধর্ম বা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নারীর মৌলিক অধিকার বা মানবাধিকারকে কোনো অবস্থায় খর্ব করা বা বিঘ্নিত করা যাবে না। আবার এই সনদেই নারীর মাতৃত্বকে সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে সমাজের প্রতি নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা, কর্মসংস্থান, খেলাধুলা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, জাতীয়তা, নাগরিকত্ব, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্বকালীন পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, পল্লি নারীদের উন্নয়ন এবং তাদের সমঅংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, আইনগত ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিয়েসহ সকল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দেশের আপামর নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে বহু পদক্ষেপ। জাতিসংঘ সিডও কমিটি সেসব পদক্ষেপের প্রশংসাও করেছে। সিডও'র ৯নং ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের নাগরিকত্ব আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমান সরকার পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালনার উচ্চ পর্যায়ে নারীদের পদচারণা এখন একটি সাধারণ চিত্র। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও কর্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করায় নারীদের সংখ্যা এবং কর্মস্পৃহা বেড়েছে বহুগুণ। কৃষি, শিল্প, ব্যাবসাবাণিজ্য, অফিস-আদালত– সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করছেন দক্ষতার সঙ্গে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

একাত্তরের রণাঙ্গনে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ

পান্নু চন্দ্র দে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর বজ্রকণ্ঠে অগ্নিঝরা সে স্বাধীনতার ডাকে উদ্বেলিত হয়েছিল বাংলার আপামর জনতা। পাকিস্তানের বৈষম্য, নিপীড়ন, অত্যাচার আর সীমাহীন অন্যায়-অবিচার থেকে চিরতরে মুক্তির জন্য শুরু হয়েছিল নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের অনেক মুক্তিসেনারা শহিদ হন। আমরা অর্জন করি একটি মানচিত্র, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী উপাধিপ্রাপ্ত সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ অন্যতম। তিনি একাত্তরের রণাঙ্গনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে ৫ই সেপ্টেম্বর শহিন হন। এ বছর তাঁর ৪৯তম শাহাদতবার্ষিকী।

১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন যশোর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার (বর্তমান নড়াইল জেলা) মহিষখোলা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে নূর মোহাম্মদ শেখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমানত শেখ ছিলেন পেশায় কৃষক এবং মাতা জেন্নাতুন নেসা ছিলেন গৃহিণী। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারানোর ফলে শৈশবেই ডানপিটে ছিলেন তিনি। কৈশোরে তিনি নাটক, থিয়েটার, গান ইত্যাদি খুব পছন্দ করতেন।

নূর মোহাম্মদ প্রথমে আনসার বাহিনীতে যোগ দিলেও পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালের ১৪ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)-এ (বর্তমানে বিজিবি) যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর পোস্টিং হয় দিনাজপুর সেক্টরে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি দিনাজপুর সেক্টরে যুদ্ধে আহত হন। যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'তমগা-এ-জং' ও 'সিতারা-এ-হরব' পদকে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে তিনি 'ল্যান্স নায়েক' পদমর্যাদা পান এবং সে বছরের আগস্ট মাসে যশোর সেক্টর সদর দপ্তরে যোগদান করেন ।

নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১-এর মার্চে গ্রামের বাড়িতে ছুটিতে ছিলেন। এরই মাঝে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গায় ইপিআর-এর ৪নং উইং এ নিজ কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। নূর মোহাম্মদ ও তাঁর টিমের ওপর ন্যস্ত হয় ৮নং সেক্টরের দায়িত্ব। তিনি নিয়োগ পান বয়রা সাব-সেক্টরে। এই সাব-সেক্টরের অধীনে গোয়ালহাটি, ছুটিপুর ঘাট, ছুটিপুর সেনাক্যাম্প, বরনী আক্রমণে অংশ নেন এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ চলাকালীন যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর সীমান্তের বরনী অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদার নেতৃত্বে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বরনীতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন নাজমুল হুদার জীবন রক্ষা করেন।

১৯৭১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। এদিন সুতিপুরে নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যূহের সামনে যশোর জেলার গোয়ালহাটি গ্রামে নূর মোহাম্মদ শেখকে অধিনায়ক করে পাঁচ জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্ট্যান্ডিং পেট্রোল পাঠানো হয়। আনুমানিক সকাল সাড়ে নয়টার দিকে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্ট্যান্ডিং পেট্রোলটির তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পেছনে মুক্তিযোদ্ধারা নিজস্ব প্রতিরক্ষা থেকে পালটা গুলিবর্ষণ শুরু করে। তবু পেট্রোলটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হঠাৎ সিপাহী নান্নু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নূর মোহাম্মদ নান্নু মিয়াকে কাঁধে তুলে নেন এবং হাতের এল.এম.জি দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন। এক সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের ভুল বোঝানোর জন্য জায়গা পরিবর্তন করে করে মেশিনগান চালাতে লাগলেন তিনি। তাঁর এ কৌশল কাজে লাগে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে গুলি ছোঁড়ার কারণে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভেবে নেয় মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় অনেক এবং তাদের অস্ত্রও পর্যাপ্ত। শত্রুপক্ষ পশ্চাৎপসরণ করতে কিছুটা বাধ্য হয়। সহযোদ্ধা নান্নু মিয়াকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে পিছু হঠতে থাকেন তিনি। কিন্তু আচমকা এক মর্টারের গোলা তাঁর ডান কাঁধে আঘাত হানে। মুহূর্তেই স্প্লিন্টারের কারণে তাঁর হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কাঁধে সৃষ্টি হয় বড়ো ক্ষত। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হাতের এল.এম.জি সিপাহী মোস্তফাকে দিয়ে নান্নু মিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন এবং মোস্তফার রাইফেল চেয়ে নিলেন। যতক্ষণ না তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে সক্ষম হন ততক্ষণ ঐ রাইফেল চালিয়ে তিনি শত্রু সৈন্যের অগ্রসরতা ঠেকিয়ে রাখেন। অন্য সহযোদ্ধারা অনুরোধ করেন তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে গেলে অন্য সবাই মারা পড়বে। শেষ পর্যন্ত তাঁর অধিনায়োকোচিত আদেশ অনুসরণ করে তাঁকে রেখেই নিরাপদে আশ্রয়ে সরে গেলেন সহযোদ্ধারা। একদিকে পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনী, সঙ্গে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র অন্যদিকে আহত সৈনিক যাঁর সম্বল একটি রাইফেল ও সীমিত গুলি। তারপরও মনোবল দমেনি। চালিয়ে যান যুদ্ধ। এই অসম অবিশ্বাস্য যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের এমন ক্ষতিসাধন করেন যে তারা নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বীর নূর মোহাম্মদ লড়তে লড়তেই শাহাদতবরণ করেন। পরে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় স্থানীয় এলাকার একটি ঝোঁপের পাশে। বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিল তাঁর লাশ। পরবর্তীতে এই বীরসেনানীর লাশ উদ্ধার করে যশোরের কাশিপুর গ্রামে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছেই সমাহিত করা হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখের অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করেন। নূর মোহাম্মদ শেখের স্মৃতি, অজানা কাহিনি গবেষণার মাধ্যমে জানা ও পরবর্তী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে ২০০৮ সালে তৎকালীন সরকার বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স নির্মাণ করে এবং তাঁর জন্মস্থান মহিষখোলা গ্রামটির নাম রাখা হয় 'নূর মোহাম্মদ নগর'। এইখানে 'বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর নামে এখানে রয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ, স্টেডিয়াম, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি মহাবিদ্যালয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ওজোন স্তর সুরক্ষায় চাই সচেতনতা

শিহাব শুভ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের একটি বিশেষ অংশ বা স্তর যেখানে তুলনামূলক মাত্রায় ওজোন গ্যাস থাকে তাকেই বলা হয় ওজোন স্তর বা ওজোন লেয়ার। এই স্তর থাকে প্রধানত স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নিচের অংশে, যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কমবেশি ২০-৩০ কিমি. উপরে অবস্থিত। এই স্তরের পুরুত্ব স্থানভেদে এবং মৌসুমভেদে কমবেশি হয়ে থাকে।

ফরাসি পদার্থবিদ চার্লস ফ্যাবি এবং হেনরি বুইসন ১৯৩০ সালে ওজোন স্তর আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ জিএম বি ডবসন ওজোন স্তর নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে তিনি ওজোন স্তর পর্যবেক্ষণ স্টেশনসমূহের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন।

১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ওজোন লেয়ার সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখটি মনোনীত করা হয়। বিশ্বব্যাপী ওজোন স্তর সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর ১৬ই সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

ওজোন স্তর বিনাশের কারণ মূলত দুই প্রকার। যথা: ১. প্রাকৃতিক কারণ; ২. মনুষ্যসৃষ্ট কারণ; নিম্নে এগুলোর কারণ বর্ণনা করা হলো–

১. প্রাকৃতিক কারণ: বজ্রপাত, অগ্নুদগম, আলোক–রাসায়নিক বিক্রিয়া ও অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব– এই সমস্ত কারণগুলো মূলত ওজোন গ্যাসের অণুকে ভেঙে দিয়ে ওজোন স্তর বিনাশ ঘটায়।

২. মনুষ্যসৃষ্ট কারণ: ওজোন স্তর বিনাশের পেছনে মূলত মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলো বেশি দায়ী। এগুলো হলো– ক) ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC): ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ওজোন স্তর বিনাশের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ১৯৯৫ সালের পর থেকে বিশেষজ্ঞরা এটি থেকে নির্গত ক্লোরিনকে ওজোন স্তর ক্ষয়ের জন্য দায়ী করেন। একটি ক্লোরিন পরমাণু প্রায় এক লাখ ওজোন অণুকে ভেঙে দেওয়ার পরও অপরিবর্তিত থাকে। ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের উৎস হলো: রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন, ফোম শিল্প, রং শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রের সার্কিট প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে সিএফসি নির্গত হয়। এছাড়াও কলকারখানা-যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া, ট্যানারি কারখানার বর্জ্য পদার্থ যা পরবর্তীতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিন গ্যাস তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

খ) নাইট্রাস অক্সাইড: নাইট্রাস অক্সাইড হলো অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস যা ওজোন বিনাশে ভূমিকা নেয়। এর উৎস হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক ব্যবহার, যানবাহন, নাইলন শিল্প প্রভৃতি।

গ) নাইট্রোজেন অক্সাইড: ওজোন স্তর বিনাশের জন্য দায়ী ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নাইট্রোজেন অক্সাইড। এর উৎস হলো জেট বিমান।

ঘ) ব্রোমিন পরমাণু: হ্যালোন যৌগ অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে গিয়ে ব্রোমিন পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এই ব্রোমিন পরমাণু ওজোন বিনাশে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এর উৎস অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।

ঙ) সালফারের কণা: ওজোন ধ্বংসের পিছনে দায়ী উপাদানগুলোর মধ্যে সালফারের কণাও ভূমিকা রাখে। কলকারখানা, যানবাহনের থেকে নির্গত ধোঁয়া প্রভৃতি এর উৎস।

উপরিউক্ত গ্যাসগুলো ছাড়া আরো কিছু গ্যাস ওজোন স্তরের ক্ষয়ে ভূমিকা রেখে থাকে। এগুলো হলো: মিথেন, মিথাইল ক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি।

জীবজগতের ওপর ওজোন স্তরের ক্ষয়ের প্রভাব খুবই মারাত্মক হতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী ওজোন স্তরের ক্ষয়ের ফলে অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে এলে নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর উপর যেসব প্রভাবগুলো পড়বে– রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে, চোখে ছানি পড়বে, ত্বকের ক্যানসার ও অন্যান্য রোগব্যাধির সূচনা হবে, প্রাণীজগতের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাবে, গড় আয়ু হ্রাস পাবে এবং উভচর প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমবে ইত্যাদি।

উদ্ভিদ ও পরিবেশের উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে সেগুলো হলো: অতিবেগুনি রশ্মি খাদ্যশস্যের ক্ষতি করবে, বৃক্ষ ও বনের পরিমাণ হ্রাস পাবে; বীজের উৎকর্ষতা নষ্ট হবে, ক্ষুদ্র মাইক্রো-অর্গানিজম, সমুদ্র শৈবাল এবং প্লাংকটন অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে নষ্ট হয়ে যাবে; উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে।

পরিবেশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো: প্রাকৃতিক খাদ্যচক্রের ক্ষতিসাধন, উষ্ণতার বৈপরীত্য ঘটবে ও পৃথিবীর উষ্ণতার ভারসাম্য বিপন্ন হবে। জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হবে, বিশ্ব উষ্ণায়ন তরান্বিত হবে। ধোঁয়াশা ও অ্যাসিড বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি। বনজ সম্পদ হ্রাস পাচ্ছে, প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে। মানুষের আয়ু বাড়লেও মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যদি ওজোন স্তরের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয় হতে শুরু করে তাহলে বিজ্ঞানীদের এইসব আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিবে, যা পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি জীবনের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়ন ও অতিবিলাসী জীবনযাপনের কারণে দিন দিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে আমাদের এই পৃথিবী।

ওজোন স্তর সংরক্ষণে যেসব উপায়গুলো আমরা অবলম্বন/অনুসরণ করতে পারি সেগুলো হলো– সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করা, সিএফসি নির্গমনের সকল উৎসগুলোর সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফারের কণা নির্গত হয় এদের উৎসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশে এদের পরিমাণ কমাতে হবে। ওজোন স্তর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত মন্ট্রিল চুক্তি যাতে বাস্তবে সবাই মেনে চলে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আর পরিবেশ রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব। অতএব, নিজেদের পরিবেশ সংরক্ষণে সকল দেশ ও জাতিকে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তাহলেই এর ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ঢাকার ১ লাখ ১৫ হাজার নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ পাচ্ছে

বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসছেন ঢাকার ১ লাখ ১৫ হাজার নতুন গ্রাহক। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ডিপিডিসি) সাবস্টেশনে সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিপিডিসির বেশ কয়েকটি ১৩২/৩৩ এবং ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পাঁচটি সাবস্টেশনে পাইলটিং ভিত্তিতে স্মার্টগ্রিড সিস্টেমও চালু করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা। চলতি বছর থেকে ২০২৩ সাল নাগাদ এর কাজ শেষ হবে। ২৫শে আগস্ট জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। এতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় 'উপকেন্দ্র নির্মাণ, পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটি ব্যাংক স্থাপন এবং স্মার্টগ্রিড ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুটি ১৩২/৩৩ গ্রিড সাবস্টেশন ও চারটি ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শিরিন আক্তার

প্লাস্টিক দূষণরোধে সরকারের পদক্ষেপ

জেসিকা হোসেন

প্লাস্টিক হলো পলিমার জাতীয় পদার্থ যাতে একই ইউনিটের অণু বার বার ব্যবহৃত হয় যাকে মোনোমার বলা হয়। প্লাস্টিক ব্যাগের ক্ষেত্রে মোনোমার হলো ইথিলিন। যখন ইথিলিনের অণুগুলো পলিমারাইজ করে পলিইথিনি পাওয়া যায়, তখন তারা কার্বন অণুর লম্বা শৃঙ্খল রচনা করে সেখানে প্রতিটি কার্বন অণু দুটি করে হাইড্রোজেন অণুর সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে থাকে। প্লাস্টিক সহজাতভাবে ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু নানা ধরনের জৈব বা অজৈব অ্যাডিটিভ ব্যবহার করে প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরি করা হয়। এই সব অ্যাডিটিভের মধ্যে আছে কালার‍্যান্ট ও পিগমেন্ট, প্লাস্টিসাইজার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্টেবিলাইজার এবং ধাতু।

প্লাস্টিক দূষণ হলো পরিবেশ কর্তৃক প্লাস্টিক পদার্থের আহরণ যা পরবর্তীতে বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল, এমনকি মানবজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। আকারের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো, মেসো অথবা ম্যাক্রো বর্জ্য এই তিন ভাগে প্লাস্টিক দূষণকে শ্রেণিকরণ করা হয়। নিয়মিত প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পলিথিন ব্যাগ, কসমেটিক প্লাস্টিক, গৃহস্থালির প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশির ভাগই পুনঃচক্রায়ন হয় না। এগুলো পরিবেশ থেকে বর্জ্যের আকার নেয়। মানুষের অসচেতনতাই প্লাস্টিক দূষণের প্রধান কারণ। প্লাস্টিক এমন এক রাসায়নিক পদার্থ যা পরিবেশে পঁচতে অথবা কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে প্রচুর সময় লাগে। তাই একে 'অপচ্য পদার্থ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তাই প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। সাধারণত উদ্ভিদকুল, জলজ প্রাণী, দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীরা প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশেও পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

১. শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা;

৩. নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্পকারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান;

৪. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

৫. বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;

৬. দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৮. দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;

৯. বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহণ, ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;

১০. ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;

১১. পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

১২. সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (স্টেট অব এনভায়রনমেন্ট রিপোর্ট) ও বিতরণ;

১৩. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;

১৪. পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

১৫. নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৬. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়নপূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;

১৭. পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজন।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো তদারকির জন্য ১৯৮৯ সালে পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯তম জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয় এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে আইন সংশোধন করা হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

রক্তের ঋণ

দেলোয়ার হোসেন

মাসুদ ঘুম থেকে জাগতে না জাগতেই মোবাইল বেজে উঠল।

এই সাত-সকালে কে আবার ফোন করল! খানিকটা বিরক্তি চোখে মোবাইলের দিকে চেয়ে থেকে শেষে মোবাইলটা কানে ধরে বলল, হ্যালো ..

অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল শরীফুলের কণ্ঠ ... মাসুদ জলদি মেডিক্যালে চলে আয়।

– কেন?

– আর বলিস না– আমার ছোটো ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।

– কোথায়, কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করল?

– সে অনেক কথা , এসে শুনবি।

– অবস্থা কী খুব খারাপ?

– তা একটু খারাপই। অপারেশন করতে হবে।

– তো আমি গিয়ে কী করব। কাটাছেঁড়া দেখলে আমার মাথা ঘুরায়।

– ব্লাড লাগবে । তোর কোনো ভয় নেই। জলদি চলে আয়, আমি অপেক্ষায় থাকলাম।

শরীফুল আর মাসুদ দুজনেই দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ করে। দুজনের মধ্যে তুই-তুকারি সম্পর্ক। মাসুদ বাথরুম সেরে একেবারে গোসল করে বের হলো। প্যান্ট-শার্ট পরল। স্ত্রী বলল, এত তাড়াহুড়া করছ কেন? অফিসের সময় তো এখনো হয়নি। মাসুদ কথা না বাড়িয়ে টেবিলে রুটি আর ডিম ভাজা দেখে খেতে শুরু করল। স্ত্রী বলল, আস্তে ধীরে খাও।

–সময় নেই, হাসপাতালে যেতে হবে।

–হাসপাতালে কেন?

–শরীফুলের ভাই অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। খুব খারাপ অবস্থা। অপারেশন করতে হবে। আমাকে হয়ত রক্ত দিতে হতে পারে।

মাসুদের স্ত্রী মাসুদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বলল, রক্ত দিতে হলে যাও। যাদের শরীর সুস্থ ভালো তারা তিন মাস পর পর ব্লাডব্যাংকে রক্ত দিতে পারে। তাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। তোমার একটা পা শুকনা, ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা কর, তাতে ক্ষতি নেই।

আল্লাহ ভরসা বলে মাসুদ পথে নামল। মেডিক্যালে পৌঁছে ফোন করল– শরীফুল আমি এসে গেছি, তুই নিচে আয়।

শরীফুল নিচে এসে বলল, ক্রাচে ভর দিয়ে উপরে যেতে পারবি? মাসুদ বলল, পারব। তারপর ওরা আস্তে আস্তে দোতলায় গিয়ে ডাক্তারের রুমে ঢুকল। শরীফুল বলল, স্যার এ আমার বন্ধু, ও রক্ত দেবে। ডাক্তার মাসুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার রক্তের গ্রুপ কি বি-নেগেটিভ?

–তা তো জানি না। আমি কখনো ব্লাড টেস্ট করাইনি।

–যান, এখনি টেস্ট করিয়ে আসুন। যদি রোগীর গ্রুপের সাথে মেলে তা হলেই রক্ত নেওয়া যাবে।

রুম থেকে বেরিয়ে মাসুদকে সঙ্গে নিয়ে পাশের বিল্ডিং-এ ছুটল শরীফুল। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়।

দুলাইনে লোক দাঁড়িয়েছে। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে ছেলেরা। তাদের মধ্যে অনেকগুলো যুবতীও রয়েছে। সবাই ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য অপেক্ষমান। নিয়ম ভঙ্গ করে কোনোভাবেই আগে বাড়ানো যাবে না ভেবেই মাসুদকে কোলদাবা করে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল শরীফুল। লাইনে দাঁড়ানো বেশিরভাগ লোকেরই চোয়াল ভাঙা। শরীরে তেমন মাংসও নেই। মাসুদ এর আগে কখনো হাসপাতালে আসে নাই। হাসপাতালের অবস্থা দেখে ওর নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

মিনিট দশেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর কর্তব্যরত লোকটির সামনে রাখা টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল শরীফুল। লোকটি বলল, বাঁ হাতটা দিন। শরীফুল তাড়াতাড়ি বলল, আমার নয়, আমার বন্ধুর ব্লাড টেস্ট করতে হবে।

–তাহলে আপনি লাইনে দাঁড়িয়েছেন কেন?

–ও কখনো হাসপাতালে আসেনি, তাছাড়া ওর একটা পা শুকনা, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটে।

–অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল?

–না, জন্ম থেকেই।

যুবকটি মাসুদের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে সূঁচ ঢুকিয়ে দু'ফোটা রক্ত নিল একখণ্ড কাচের স্লাইডের উপর। তারপর ওরা এসে ঘরের

এক কোণে দাঁড়ালো। মিনিট দশেক পর শরীফুল এসে হতাশ কণ্ঠে বলল, হলো না!
–কেন, গ্রুপ মেলেনি?
–না, আমার দরকার বি নেগেটিভ তোর রক্তের গ্রুপ বি পজেটিভ। ঠিক তখনই লাবণ্যময়ী সুশ্রী এক মেয়ে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্লান্ত মুখে বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার বোনের আজ অপারেশন কিন্তু বি পজেটিভ রক্ত কোথাও পাচ্ছি না। আপনি যদি আমার বোনের জন্য রক্ত দিতেন তাহলে...। তখনই আরো দুটো মেয়ে এসে দাঁড়ালো সেখানে। তারা মিনতির সুর ঢেলে বলল, হ্যাঁ ভাই আমরা সবাই ব্লাড টেস্ট করিয়েছি কিন্তু গ্রুপ মেলে নাই।

মাসুদ ক্রাচে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকাল। খুব লজ্জা লাগছিল তার। ও এমনিতেই কালো আর মোটা সোটা। মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাঁড়িগোফ। তবে, দাঁতগুলো সুন্দর। সুন্দরী মেয়েদের কথায় দেহের কলবজা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল। মাসুদ হাঁসার চেষ্টা করল কিন্তু হাসিটা ঠিক ফুটল না। বুকে সাহস নিয়েই বলল, আপনাদের বোনের কী হয়েছে? রক্ত লাগবে কেন? একটি মেয়ে বলল, আপা প্রেগনেন্ট ছিল, হঠাৎ বাথরুমে পড়ে যায়। ব্লিডিং হচ্ছে, এখনি অপারেশন না করাতে পারলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। অথচ টাকা দিয়েও রক্ত পাওয়া গেল না।

মাসুদ মনে মনে ভাবল, আমি তো রক্ত দিতেই এসেছিলাম। একজনের লাগল না আর একজনের লাগছে। মুখটা নিচু করে বলল, ঠিক আছে। বড়ো মেয়েটি বলল, আপনি আমাদের বাঁচালেন। তখন সবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মেয়েটি তখনই মোবাইল করল দুলাভাই রক্ত পাওয়া গেছে , আপনি এখানে চলে আসুন।

হাসপাতালের এক কোণে তিন-চারটি যুবক মাসুদের দিকে চেয়ে হাসছিল। একজন বলল, ইস্ আমার যদি বি পজেটিভ রক্ত থাকত তাহলে কতই না ভালো হতো। মাসুদ ওদের কথায় কান না দিয়ে মেয়েদের সাথে পাশের ঘরে ঢুকল। মাসুদের হাতে একটা ছাপানো কাগজ দেওয়া হলো। একটি মেয়ে বলল, এখানে আপনি সই করুন। মাসুদ সই করে দিল। এমন সময় এক ভদ্রলোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, কে রক্ত দিচ্ছে? মেয়েটি মাসুদকে দেখিয়ে বলল, ইনি রক্ত দেবেন। ভদ্রলোক মাসুদের হাত ধরে বললেন, খুব উপকার করলেন ভাই। চিরকাল মনে থাকবে। আপনার নামটাতো জানা হলো না। পাশের মেয়েটি বলল, উনি মাসুদ ভাই।

হাসপাতালের লোক এসে মাসুদকে একটা বিছানায় শুইয়ে ডান হাতটা টেনে নিয়ে ডেটল তুলো দিয়ে ঘষতে লাগলেন। হাতের শিরা খুঁজে পেতে বেশ সময় চলে গেল। সুচ ঢুকাতেই খচ করে উঠল মাথার মধ্যে। একজন বললেন, নরমালি শ্বাস নিতে থাকুন। একজন কাঠখোট্টা চেহারার লোক পলিথিনের ব্যাগটা চেপে চেপে রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাসুদের পায়ের দিকের জানালা খোলা। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা চোখে পড়ল। বেলা দশটার খিলখিল রোদ বাতাসে দোল খাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ির হর্ন উঠে আসছে চার তলা পর্যন্ত। রক্ত নেওয়ার কাজে ব্যস্ত দুজনার একজন একটু ঝুকে টং গলায় প্রশ্ন করল, কী করা হয়?

–জি আমি পত্রিকা অফিসে কাজ করি।
–পেসেন্ট কি রিলেটিভ কেউ?
–না, চিনি না।
–তাহলে!
ভ্রুতে গিট ফেলে লোকটি তাকাল মাসুদের দিকে। মাসুদ মনে-মনে ভাবল, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। এসেছিলাম একজনকে রক্ত দিতে কিন্তু অবস্থার ফেরে পড়ে দিতে হচ্ছে অচেনা কাউকে। সবই তাঁর ইচ্ছা।

রক্ত দেওয়ার পর ছিমছাম একটা রুমে ইজি চেয়ারে বসতে হলো তাকে। এটাই নিয়ম। চশমা পড়া লিকলিকে একজন ডাক্তার এসে চশমার ফাঁক দিয়ে মাসুদকে এক নজর দেখেই নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। এ রুমটা বেশ ঠাণ্ডা। আর একজন এসে বললেন, আপনাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে। তখন মেয়েগুলো এঘরে এসে ঘুরঘুর শুরু করেছে। ধকল গোছানো চেহারা নিয়ে ভদ্রলোক এসে বসলেন চেয়ার টেনে। মাসুদ চুপচাপ। ভদ্রলোক বললেন, আমি কাদের খান। মাসুদ বুঝতে পারে লোকটি এখনি বলকানো কথাবার্তা শুরু করবে। প্রথম আলাপ করা মেয়েটিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

অনেক দিনের পুরনো পাওনাদারের মুখোমুখি পড়ে যাওয়া ভঙ্গিতে নিজের হাত কচলাতে-কচলাতে কাদের খান বললেন, আপনি যে উপকার করলেন এই ঋণ ...

মাসুদ হাত তুলে নিভিয়ে দেয় তার বলকানো কথার শিখা। রক্ত দিতে এসেছিলাম দিলাম –এর মধ্যে ঋণ শব্দটা বড়ো বেখাপ্পা। এসব পেনপেনানি ভালো লাগে না।

ভদ্রলোক বললেন, আমি মৎস্য বিভাগে আছি। ফকিরাপুলে আমার বাসা। আপনাকে আমার বাসায় যেতেই হবে।

এসব বাড়াবাড়ি মাসুদের ভালো লাগে না। ও বুঝতে পারে আবেগে লোকটার বুকের ভেতরটা ভিজে একাকার। অনেক কিছু বলার জন্য মন আকুপাকু করছে। কিন্তু সেসব শুনার ইচ্ছে তার নেই। হঠাৎ সে বলল, আপনি একবার আপনার স্ত্রীর কাছে যান। তাকে দেখে আসুন, আমি তো আছি। মাসুদের কথায় লোকটা যেন উড়াল দিয়ে প্রস্থান করল।

এই ফাঁকে উঠে দাঁড়াল মাসুদ। একবার ভাবল শরীফুল কি ওর ভাইয়ের জন্য রক্ত পেয়েছে? আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল মাসুদ। আকাশের দিকে তাকাল। ঝরঝরে রোদ্দুরে একঝাঁক পায়রা আনন্দে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। তারপরই শরীরটা হালকা বোধ করল সে। তবে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ভাবল পেট ভরে পানি খেতে হবে।

এর প্রায় দু'মাস পর মাসুদ ক্রাচে ভর দিয়ে শাহবাগের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। প্রকৃতিতে ফাগুনের ছোঁয়া। ঝিরিঝিরি দখিনা মলয়। বেশ লাগছিল। হঠাৎ কাদের খানের সামনে পড়ে গেল মাসুদ।

–আজ আপনাকে ছাড়ছি না। সেদিন যা ফাঁকি দিয়েছিলেন– অনেক খুঁজেছিলাম আপনাকে।
–আপনার স্ত্রী ভালো আছেন তো?
–খুব ভালো আছে। আজ আপনাকে পালাতে দেব না। আমার বাসায় যেতেই হবে।
–আজ আমার সময় হবে না। খুব ব্যস্ত আমি। বুঝতেই তো পারছেন ঘুরেঘুরে বিজ্ঞাপন আনতে হয়।
মাসুদ পাশ কেটে বেরিয়ে যেতে চায় কিন্তু কাদের খান তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।
পাশেই দোকানের সামনে দাঁড়ানো সাদা ফিনফিনে সুখী-সুখী মহিলার দিকে আঙুল তুলে কাদের খান বলল, পরিচয় করিয়ে দিই চুমকী, আমার স্ত্রী। যাকে আপনি রক্ত দিয়েছিলেন। মাসুদ হাত তুলে সালাম জানালো।
–মাসুদ ভাই, তাহলে কবে আসবেন? এই আমার কার্ড। আপনি এলে খুব খুশি হব।
–যাব একদিন– আজ আমি আসি।
গভীর আত্মতৃপ্তিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে মাসুদ। মাসুদ মুক্তি পেয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে ক্রাচে ভর দিয়ে পা বাড়ায়।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা

সোহরাব পাশা

তোমার সুখ্যাতি বিশ্বময়
কেন না তুমি তো মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে
আঁধার ভেঙে ছিনিয়ে এনেছ
নতুন ভোরের আলো
এই মৃত্তিকা, মানুষ, গোলাপ বাগান
আর ভোরের পাখিরা সে কথা জানে,
শুধু বাংলাদেশ আর বাঙালির নয়
সারা পৃথিবীর জন্যে এনেছ সোনালি
দিন, স্বপ্নময় সুবাতাস ;
পিতৃহারা, মাতৃহারা, কত প্রিয় স্বজন হারানো
বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত, অকৃপণ হৃদয়ে তুমি
ভালোবেসেছ বাংলার দুঃখী মানুষকে,
অশ্রুভরা চোখে ভালোবেসেছ এই
বাংলাদেশকে,
তুমি নিজ হাতে মুছে দিয়েছ মুক্তিযুদ্ধে
সন্তানহারা দুঃখী মায়ের চোখের জল,
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গজননীর কন্যা
তুমি 'দেশরত্ন' শেখ হাসিনা, নক্ষত্রের মতো
তোমার নাম চির উজ্জ্বল অম্লান থাকবে এই বাংলায়
আর বাঙালির হৃদয়াকাশে;
শহরে-বন্দরে, গ্রামগঞ্জে, সবখানে
আজ আনন্দের যে ঝরনাধারা, সে তো তোমারই জন্যে;
আন্তর্জাতিক বিশ্বে
তুমি উজ্জ্বল করেছ বাংলাদেশের সুনাম,
বাঙালি শিখেছে আজ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
সারা বিশ্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবার
বিশ্ব জেনে গেছে শ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা
বাংলাদেশের অহংকার।

কোথায় জোয়ার

সৈয়দা রাবেয়া

নীল পেন্সিল দাগে গড়িয়ে পড়ে ঢেউ
খাতা ভরে রেখা টানে ভেবেছি সাগর
আকাশ আড়ি দেওয়া মেজাজে থাক,
একদিন দেখি নিজের প্রবল ছায়া,
শৈশব মায়া ছেড়ে ওপরে উঠা যায়!
আয়ত নক্ষত্ররাজিকে পরাস্ত করে
ছোঁয়া চেয়েছিলাম তোমার! বলো দেশ
জোরে বলো বেঁচে আছ কলকল স্বরে
শুকনো নদী খাল জনৈক পদ্মা শুধু!
হু হু পাড় যমুনা জড়োসড়ো মেঘনা
তিস্তা খালে বালু ছায়া ধুধু দিনরাত
বন কাঁপে যেন হবে সবুজ নিপাত
বয়ে চলে স্বপ্ন তবু কোথায় জোয়ার
দেখেছিলাম কখনো নদী ঢেউ আর...
কখনো ঐ নদীর নাম বন্যা।

ধুপছায়া মেঘ

মিয়াজান কবীর

অলেক আমার ধুপছায়া মেঘ
দূর দিগন্তে ভাসে,
অলেক আমার উচ্ছ্বাস আবেগ
গহিন হৃদয় মাঝে।
অলেক আমার সোহাগস্মৃতি
বিরহ ব্যথায় ঝরনাগীতি
বেহাগ সুরে বাজে নীতি
বাড়ায় প্রাণের উদ্বেগ।
অলেক আমার প্রদীপভাতি
নিভে এলো আঁধার রাতি
কৃষ্ণতিথির হারাসাথি
অলেক আমার অলেক।

মেঘ বালিকা

শাহনাজ

মেঘ বালিকা, আমায় তুমি সঙ্গে নেবে?
মেঘ বালিকা সুতোকাটা ঘুড়ির মতো আমার মনটি
কেবল উড়ে, কেবল উড়ে, কেবল উড়ে।
অদৃশ্য এক লাটাই হাতে, কে যে আমায়
বন্দি করে গৃহকোণে।
মেঘ বালিকা, কষ্ট বড়ো কষ্ট
প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে ওঠে, গৃহকোণের কারাবাসে
আমায় তুমি সঙ্গে নেবে?
তোমার সঙ্গে আমার ভারি সখ্য
পৃথিবীর সমান দুঃখ তোমার
তুমি তো কাঁদ, আমিও কাঁদি।
মেঘ বালিকা, আমায় তুমি সঙ্গে নেবে?
আমার মা'তো কবেই গেছে মরে
মায়ের মুখটি যখন পড়ে মনে
ইচ্ছে জাগে তোমার সঙ্গে উড়ে গিয়ে
ঘুরে আসি তারার দেশে।
হয়েই যদি যায়গো দেখা মায়ের সঙ্গে
আবার আমি মাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরে
একটুখানি কাঁদবো শুধু।
মাগো আমি আসব ডাকবে যখন তুমি
তুমি কিগো ফুলের পরাগ গায়ে মেখে ঘুড়ে বেড়াও
তারার দেশে, তাইকি তোমার খোশবু এমন!
মেঘ বালিকা মায়ের কাছে নিয়ে চলো
সখী আমার, হৃদয়খানি উজাড় করে দেব তোমায়
আমায় যদি নিয়ে চলো তারার দেশে।
গৃহকোণের বন্দিদশা ঘুচবে আমার।

শেখ হাসিনা উন্নয়নের মডেল

আতিক আজিজ

শেখ হাসিনা জাতির জন্য জীবন বাজি রেখে
দেশোন্নতির সকল কাজই করছেন একে একে।
শেখ হাসিনার বুদ্ধিমত্তা কৃতিত্বের সুনাম
মুছে দিচ্ছেন বাঙালিদের যা ছিল দুর্নাম।
বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় তুলে ধরার কাজে
সাজাচ্ছেন দেশ শেখ হাসিনা নিত্য নব সাজে।
উন্নয়নের রোল মডেল আজ এদেশ বিশ্বের কাছে
স্বদেশ গড়ার সুদক্ষতা শেখ হাসিনার আছে।

বাস্তবে রূপ পাচ্ছে

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

শেখ হাসিনার স্বপ্নের দেশ বাস্তবে রূপ পাচ্ছে
পুরনো সব চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে।
সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন
হয়ে গেছে দৃশ্যায়ন,
দেখলে ভরে হৃদয় ও মন
প্রাণ খুশিতে নাচছে।
কী অপরূপ রূপটা যে তার আজ শোভা পাচ্ছে,
মুখের ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলাতো না যাচ্ছে।

দেশ মাতা

মিজানুর রহমান মিথুন

তোমার মুখে সতেরো কোটি মানুষের
অনাবিল সুখের হাসি
সংকটে সংগ্রামে দুর্দিনে তুমি
আমাদের অবিচল আস্থা
তোমার চোখে জাতির পিতার
অসমাপ্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ,
যে বাংলাদেশ বিনির্মাণে তোমার
আপোশহীন অক্লান্ত বন্ধুর পথ চলা।
তুমি বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে তুলে
ধরেছো অনন্য উচ্চতায়,
অসহায় সম্বলহীনদের জন্য তুমি
মমতাময়ী আশ্রয়
মানবতার জননী তুমি,
জন্মদিনে তোমার দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা।

চাবি

শাহরিয়ার নূর

দুয়ার রুদ্ধ রাখে কার সে শক্তি
তালা সেরে মিস্ত্রি চলে নিজ মনে
বাধা না মানা প্রাণের দাবিতে?
খুলে দিতে হয় দোর
জনমের মতো কোনো
তালা বদ্ধ থাকে?
পরান পাখির গান
ফকির লালন জানতেন চাবির সন্ধান
বুকের ভেতর কষ্ট না আঁধার–
মানুষ কাহার!
তার নাম মনে লই
খুলে গেলে সুখে ফেরা
গোলবৃত্তে ঝোলানো চাবির সারি
হাতে বাজে একগোছা আর্তনাদ
সে হাঁক দেয় না, চাবিতে ঝাঁকিয়ে হাঁটে!

অপেক্ষা

অদ্বৈত মারুত

ডাকের অপেক্ষায় থেকে থেকে অবশেষে ডাকঘরে–
গিয়ে দেখি চিঠিখানা পড়ে আছে সমগ্র টেবিল
ধুলোয় শরীর মেখে চুপচাপ বসে আছে পত্রের খোপ
এমন হাহাকার ডাকঘর আর দেখিনি কোনোদিন!
অথচ পাশেই আবাদি ভূমি প্রসূনে প্রোজ্জ্বল বৃক্ষসদন
মাতৃবিয়োগ বেদনার মতো শিথিল হয়ে পড়ে আছে
একবুক নির্জনতা; খোপগুলো নীরব থাকে ডাকঘরে
যেন আবারো আসবে চিঠি দাম্পত্যের কলরোল দিন
সেইসব দিন আগত সন্ধ্যার মতো যেন না হয় বিলীন।

একটি কড়ি পথের

অমিত রেজা

এক দুনিয়া আগুন জ্বেলে
একটু দুঃখ দিলাম
দীর্ঘশ্বাস ওঠে? থাক না হয় তোমার
আর কী আছে দেওয়ার
জমতে পারে চোখের কোণে
বিস্তীর্ণ সবুজ দলে
শিশির নীরব কষ্ট।
পদপ্রান্তে বেলা নামে– খেয়াঘাট পাব?
একটি কড়ি পথের কাকে এনে দেব
পথের শুরু না শেষ কোনটি বা কার বেশ
শিশির হারিয়ে গেছে ঘাসে!

জননেত্রী শেখ হাসিনা

সুষমা ফাল্গুনী

বঙ্গবন্ধুকন্যা তুমি জননেত্রী শেখ হাসিনা
উন্নয়নের ধারায় দেশ নেতৃত্বে তুমি অনন্যা।
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া
জানি তুমি করবে পূরণ মেধা মনন দ্বারা।
কাজ করছ দেশের তরে স্বার্থ ভুলে গিয়ে
জনগণের নেত্রী তুমি গর্ব তোমায় নিয়ে।
কুসুমসম হৃদয় তোমার থাকো সবার পাশে
বিপদে তুমি সহায় হও অভয় যেন আসে।
বাংলাদেশ উন্নত হোক এই তো মোদের আশা
জীবন ভরে পাবে বাংলার জনগণের ভালোবাসা।

জীবন মানেই

নুসরাত জাহান

জীবন মানেই কষ্ট, যন্ত্রণা
জীবন মানেই বেঁচে থাকার প্রেরণা।
জীবন মানেই ভালোবাসাহীনতা
জীবন মানেই ধৈর্য আর ধৈর্য
জীবন মানেই একটু শান্তি একটু ভালোবাসা
জীবন মানেই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা।
জীবন মানেই অন্যকে ভালোবাসা।
জীবন মানেই অন্যের জন্য কাজ করে যাওয়া।

করোনা

মোছা. শাম্মী আখতার

করোনার ছোবল চোখে পড়ে নজরে,
অসহায় মানুষগুলো চলে যাচ্ছে কবরে।
যদি মোরা মানি সমাজিক দূরত্ব,
ভিটামিন খাবারে দিতে হবে গুরুত্ব।
মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি উপায় নেই আর কোনো,
সকলে মিলে দূর করব করোনার প্রভাব।
অগণিত মানুষ ভয়ে আছে সংক্রমণে,
কখন বুঝি করোনা ঢুকে পড়ে শরীরে।
করোনার ওষুধ হয়েছে আবিষ্কার!
সেই আশায় বুকভরা ভরসায়
দিন কাটে কখন পাব প্রতিকার।

শরৎ ঋতু

মুহাম্মদ ইসমাঈল

প্রকৃতির স্নিগ্ধতার আমেজ শরৎ ঋতু
নাগরিক জীবনে সাদা মেঘ দেখার
কাশফুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়
পঞ্জিকার পাতায় শরৎ এসেছে।
ইট সুরকির এই ব্যস্ত নগরীতে নেই শুভ্র কাশবন
নেই শরতের এই আকাশে নীল
রোদ-বৃষ্টির খেলা নেই
শিশিরভেজা শিউলি নেই
প্রকৃতি কেমন জানি হয়ে গেছে
প্রকৃতি এখন আগের মতো
কাছে আসে না।
আসে না সে রানির সাজে
অথচ তার রাজা সব সময়
প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে ॥

সেদিন আসবেই

মো. জামাল উদ্দিন

তোমরা কেউ হাল ছেড় না
তরি জাগবেই আসবে সফলতা
ক্যাম্পাস আবার মুখরিত হবে
স্বপ্নচারীর পদচারণায় কাটবে নীরবতা।
বাংলা নববর্ষ ফিরে পাবে তার স্বরূপ
বাঙালির ঐতিহ্য হালখাতা খুলবে মহাজন
মঙ্গল শোভাযাত্রা দেখবে বিশ্ববাসী
রমনার বটমূলে হবে বৈশাখি মেলার আয়োজন।
শুধু সময়ের অপেক্ষায়, সেদিন আসবেই
মসজিদ- মন্দির গির্জায় হবে নির্ভয়ে প্রার্থনা
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে যাবে ঈদগাহে
নামাজ শেষে হবে কোলাকুলি এটাই হোক আরাধনা।
চারুকলার দেয়ালে দেয়ালে রঙিন অক্ষরে
ফুটে উঠবে আরো কত অমর বাণী
রাজপথে ফুটে উঠবে আলপনায় ভরা
নতুন প্রজন্মের আঁকা স্বপ্নের হাতছানি।
শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে,
দলবেঁধে সবাই জানাবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা
শিক্ষার্থীদের মনকাড়া কুচকাওয়াজে ভাঙবে
মাঠের নীরবতা, তারাইতো দেশের নবযোদ্ধা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ই আগস্ট ২০২০ ঢাকায় বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবসে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন-পিআইডি

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা মহান স্বাধীনতার রূপকার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে বলেছেন, বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৭৫ সালের এদিনে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদতবরণ করেন। একইসঙ্গে শহিদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এমন ঘটনা কেবল দেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা মহান স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৪৮ সালে ভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬২ শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন আপোশহীন। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অমলিন, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মহান ঐতিহ্য

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১১ই আগস্ট শুভ জন্মাষ্টমী 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, জন্মাষ্টমী হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক ও সমাজসংস্কারক। সমাজ থেকে অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়ন ও হানাহানি দূর করে মানুষে মানুষে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মূল ভাবনা। সনাতন ধর্মমতে, অধর্ম ও দুর্জনের বিনাশ এবং ধর্ম ও সুজনের রক্ষায় তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে আগমন করেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের মহান ঐতিহ্য। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি অটুট রাখতে হবে। মানবকল্যাণ সব ধর্মের মূল বাণী। সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তা জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে লাগানোর জন্য আমি দেশের সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানাই।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

শোক ও শ্রদ্ধায় স্মরণ বঙ্গবন্ধুকে

শোক ও শ্রদ্ধায় ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিনটি ছিল জাতীয় শোক দিবস। এই দিনে গোটা জাতি শপথ নিয়েছে, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মৌলবাদমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ে তোলা এবং বঙ্গবন্ধুর পলাতক বাকি খুনিদের ফিরিয়ে এনে দ্রুত বিচারের রায় কার্যকর করার। করোনাকে উপেক্ষা করে শোকাবহ এই দিনে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে সিক্ত হয়েছে টুঙ্গিপাড়ার সমাধিস্থল, ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বনানী কবরস্থান। ভোরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর এই মহান নেতার প্রতি সম্মান জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সশস্ত্রবাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়। বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর ১৫ই আগস্টের শহিদদের রুহের মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বনানী কবরস্থানে যান। সেখানে তিনি তাঁর মা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেলসহ ১৫ই আগস্টের অন্য শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় ১৫ই আগস্টের শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

'জয়তু বঙ্গমাতা' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই আগস্ট বঙ্গমাতার ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন। তিনি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এর জীবন সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন এবং তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে রসদ নিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে বর্তমান প্রজন্মের নারীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে 'জয়তু বঙ্গমাতা' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং ১০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ল্যাপটপ, দরিদ্র ও অসহায় নারীদের মধ্যে তিন হাজার ২০০ সেলাই মেশিন এবং এক হাজার দরিদ্র নারীকে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জনপ্রতি দুই হাজার টাকা করে বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনা মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুবকদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জুলাই দুই দিনব্যাপী 'ঢাকা ও আইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০'-এর অনুষ্ঠান ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুবকদের স্থিতিশীল ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধারণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যুবকদের স্থিতিশীল ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ধারণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পৃক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে এবং প্রাণবন্ত যুবকরা তা দেখাতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালিত

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই আগস্ট চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) ব্যবস্থাপনায় তথ্য ভবনে ডিএফপি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ আলোচনাসভায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের সশ্রদ্ধ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভায় তথ্যমন্ত্রী ১৫ই আগস্টে নির্মম হত্যাকাণ্ডে শহিদ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৬ই আগস্ট ২০২০ ঢাকায় তথ্যভবন মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। এসময় তথ্যসচিব কামরুন নাহার উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে হত্যা করার লক্ষ্যে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর খুব দ্রুত পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা আসে। সে কারণেই দেখতে পাই, জুলফিকার আলী ভুট্টো আগস্ট মাসের ১১ কিংবা ১২ তারিখ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, এ অঞ্চলে একটি বড়ো পরিবর্তন হতে যাচ্ছে অর্থাৎ হত্যাকারীদের সঙ্গে পাকিস্তানিদের যোগাযোগ ছিল। সে সময় এই হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের উল্লসিত হওয়া, পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের কথা বলা– এই ঘটনাগুলোই বলে দেয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে হত্যার লক্ষ্যে। সুতরাং যারা এই পটভূমি রচনা করেছে তাদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন আর পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে সাধুবাদ জানিয়ে এবং যারা ক্ষমতা দখল করেছিল তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে যারা পত্রপত্রিকায় কলাম লিখেছিল, শিরোনাম বানিয়ে ছিল, তাদেরও মুখোশ উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

তথ্যসচিব কামরুন নাহারের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীন। ডিএফপি'র মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া (অ.দা.) সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ডিএফপি নির্মিত 'স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো' প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শনের সময় একটি ভাবগম্ভীর আবহ তৈরি হয়। অনুষ্ঠান শেষে তথ্য ভবনের ত্রয়োদশ তলায় চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ওপর পক্ষকালব্যাপী আলোকচিত্র, পোস্টার ও ক্রোড়পত্র প্রদর্শনী এবং জাদুঘর উদ্‌বোধন এবং নিচতলায় ডিএফপি'র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের নামফলক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী। জাদুঘরে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ ধারণে ব্যবহৃত ক্যামেরা ও শব্দ ধারণ যন্ত্র, ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি ইউনেস্কো সনদসহ গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্থান পেয়েছে।

দায় এড়াতে পারে না স্যোশাল মিডিয়ার সার্ভিস প্রোভাইডাররা

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সার্ভিস প্রোভাইডাররা তাদের প্ল্যাটফর্ম অপব্যবহারের দায় এড়াতে পারে না। ৬ই আগস্ট সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে *শেখ হাসিনা ও ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া পৃথিবীর বাস্তবতা। মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়া যত ব্যবহার করে বা দেখে, অন্য মিডিয়ার ক্ষেত্রে তত সময় ব্যয় করে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সময়ে সময়ে এই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও অস্থিরতা তৈরি করা হয়। এটি ব্যবহার করে চরিত্র হনন ও নানা ধরনের মিথ্যা সংবাদও পরিবেশন করা হয়। কোনো পত্রিকা বা টেলিভিশনের মাধ্যমে যদি এ ধরনের কাজ করা হয়, আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী সেই পত্রিকা বা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ দায়ী হয়, তাহলে এ ধরনের কাজের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কর্তৃপক্ষ কেন দায়ী হবে না?

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৩৮ ধারায় সোশ্যাল মিডিয়ার সার্ভিস প্রোভাইডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন, চরিত্র হনন, সমাজে অস্থিরতা বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি– এই ধরনের অপরাধমূলক কাজে স্যোশাল মিডিয়ার সার্ভিস ব্যবহার করা হলে সেই সার্ভিস প্রোভাইডারদের জরিমানাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে আরো একটি নতুন আইন করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।

তথ্যমন্ত্রী এসময় *শেখ হাসিনা ও ঘুরে দাঁড়ানোর বাংলাদেশ* গ্রন্থের সম্পাদক শামীম আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বইটিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘটা উন্নয়নের বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শুধু ঘুরে দাঁড়িয়েছে তা নয়, তাঁর জাদুকরী নেতৃত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

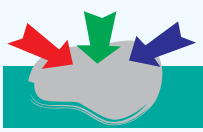

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঈদুল আজহা পালিত

১লা আগস্ট: করোনা মহামারির সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় ঈদুল আজহা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই আগস্ট ২০২০ গণভবনে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন–পিআইডি

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'। এ বছর সপ্তাহটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'মাতৃদুগ্ধদানে সহায়তা করুন-স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ুন'।

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস পালিত

৬ই আগস্ট : বিভিন্ন সংগঠন ভার্চুয়ালি নানা আয়োজনে পালন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '৭৯তম প্রয়াণ দিবস'।

বিশ্ব বন্ধু দিবস

নানা আয়োজনে সামাজিক দূরত্ব মেনে ভার্চুয়ালি নানা আয়োজন উদ্‌যাপিত হয় 'বিশ্ব বন্ধু দিবস'।

বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৮ই আগস্ট: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ বছর অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল–'বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক'।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

৯ই আগস্ট: জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে প্রতিবছরের মতো এবারো যথাযথভাবে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালিত করা হয়।

শুভ জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত

১১ই আগস্ট: হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি 'শুভ জন্মাষ্টমী' সারা দেশে ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস

১২ই আগস্ট: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস' পালিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস

১৫ই আগস্ট: সারা দেশে যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিকে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনাসভা, দোয়া মাহফিল ও বিশেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

ডিএফপি'তে জাতীয় শোক দিবস পালিত

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডিএফপি) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

একনেকে ৭ প্রকল্পের অনুমোদন

১৮ই আগস্ট: জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেকে ৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৭টি প্রকল্পের অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: শরিফুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা টিকা বাংলাদেশও পাবে

করোনা ভাইরাসের টিকা উদ্ভাবনে এগিয়ে থাকা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রজেনেকা বা যুক্তরাষ্ট্রের নোভাভ্যাক্স এই দুটির

কোনো একটি সফল হলেই টিকার ডোজ পাবে বাংলাদেশ। বিশ্বের নিম্ন ও নিম্ন-মাধ্যম আয়ের দেশগুলোকে টিকার ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (গ্যাভি) বাংলাদেশসহ ৯২টি দেশের জন্য সুখবর

দিয়েছে। ৭ই আগস্ট গ্যাভি এক বিবৃতিতে বলেছে, ২০২১ সালে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য সম্ভাব্য নিরাপদ ও কার্যকর টিকার ১০ কোটি ডোজ উৎপাদন ও বিতরণ ত্বরান্বিত করতে সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া (এসআইআই), গ্যাভি ও বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস একটি চুক্তি করেছে। চুক্তির আওতায় অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রজেনেকা ও নোভাভ্যাক্সের করোনা ভ্যাকসিন অনুমোদন পাওয়ার পর ১০ কোটি ডোজ তৈরি করে বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করা হবে। আর এই সরবরাহের দায়িত্বে থাকবে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট। এজন্য ওই প্রতিষ্ঠানকে ১৫ ডলার তহবিল দেবে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। 'কোভ্যাক্স অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট' (এএমসি) কাঠামোর আওতায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি ডোজ ভ্যাকসিনের দাম পড়বে সর্বোচ্চ ৩ ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৫৪ টাকা হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মহামারিতেও রেমিট্যান্সে রেকর্ড বাংলাদেশের

করোনা মহামারির মধ্যেও এক মাসে রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মাসে এত বেশি রেমিট্যান্স আগে কখনো আসেনি। শুধু জুলাই মাসেই ২.৬ বিলিয়ন (২৬০ কোটি) মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। ৪ঠা আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা গাজী তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত জুনের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১.৮৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রবাসী আয়ের এ ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার জন্য সরকারের সময়োপযোগী ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাসে এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩৭.২৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। গত ৩০শে জুন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৬.০১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে যেটি ছিল সর্বোচ্চ।

জাতিসংঘের জনসেবা পুরস্কার পেল ভূমি মন্ত্রণালয়

ই-নামজারি (ই-মিউটেশন) কার্যক্রমের জন্য 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি পাবলিক (সরকারি) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ল্যু জেনমিন কর্তৃক জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাকে দেওয়া এক চিঠির বরাত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জনস্বার্থে সেবার অসামান্য অর্জনে (ভূমি) মন্ত্রণালয়টি শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ জনপ্রশাসনের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে তারা মনে করছেন। এই কাজ (ই-নামজারি) জনসেবায় ব্রতী হতে অন্যদেরও অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে।

কেউ গৃহহীন থাকবে না

হাজার বছরের পরাধীনতা কাটাতে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেই স্বাধীনতার সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এগিয়ে চলেছে বর্তমান সরকার। মুজিববর্ষে কাউকে গৃহহীন রাখা হবে না এমন অঙ্গীকার করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। সব কিছু ঠিক থাকলে প্রায় ৯ লাখ গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণের বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

তথ্য অনুযায়ী দেশে এখন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি গৃহহীন পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে জমি আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবার রয়েছে পাঁচ লাখ ৮৯ হাজার ৭৫০টি। ঘর বা জমি কোনোটিই নেই এমন পরিবার রয়েছে দুই লাখ ৯২ হাজার ২৮৩টি। জমি ও ঘর কোনোটিই নেই এমন পরিবারগুলোকে জমির বন্দোবস্তসহ ঘর করে দেওয়া হবে। আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রকল্প থেকে যাদের জমি থাকলেও ঘর নেই, তাদেরও ঘর করে দেওয়া হবে। প্রতিটি ঘরে পাঁচ ফুটের একটি বারান্দা, দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর ও একটি টয়লেট থাকবে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে খরচ ধরা হয়েছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। ঘরের ওপরে থাকবে টিনের ছাউনি। দেয়াল ও ফ্লোর হবে ইটের। যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশের পথিকৃৎ সজীব ওয়াজেদ জয়

সজীব ওয়াজেদ জয় একজন ভিশনারি ও মেধাবী নেতা যার জীবন দর্শনের মূলে রয়েছে সততা। জীবন ও কর্মের সকল ক্ষেত্রেই সততার অনুশীলন করছেন বলেই তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাস্তবায়নে এতটা সফল। তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের পথিকৃৎ। ২৭শে জুলাই তথ্য ও যোগাযোগ

প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অনলাইনে 'প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের কর্মজীবন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় সজীব ওয়াজেদের নির্দেশে। তিনি সব সময়ই জনগণের অর্থে কোনো প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের উপকার এবং রিটার্ন কী আসবে তা বিবেচনায় নিতে পরামর্শ দেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ২০০৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন তার প্রণেতাদের একজন সজীব ওয়াজেদ। কিন্তু তিনি শুধু রূপকল্প প্রণয়নের সাথে যুক্ত থেকে বসে থাকেননি, তাঁর বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছেন। ২০০৯ সালে যখন আইসিটি পলিসি প্রণয়ন করা হয় তারই উদ্যোগে, যেখানে ৩০৬টি করণীয়সহ তা বাস্তবায়নে একশন প্ল্যান ও সময় নির্ধারণ করে দেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল মানুষ কীভাবে পাচ্ছে তা আমরা এই করোনাকালে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। স্বাস্থ্যসেবা থেকে কোরবানির গরু কেনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১২ই আগস্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ

ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) সামার-২০২০ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে তিনি আগামী দিনের পথ চলায় নিজেদের উদ্ভাবনী মানসিকতাকে কাজে লাগাতে নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইন্ডাস্ট্রি ও অ্যাকাডেমিশিয়ানদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি ।

প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশে শিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সারা দেশে ২৮টি হাইটেক পার্ক, ৬৪টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। পাঁচটি হাইটেক পার্কের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বাকিগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা আইসিটি খাত থেকে ১০০ কোটি ডলার রফতানি করেছি। আগামী পাঁচ বছরে আরো ৫০০ কোটি ডলার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কাজ করছি। নতুন প্রজন্মকে উদ্যোক্তা কিংবা উদ্ভাবক হয়ে বাংলাদেশকে মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে জানান তিনি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

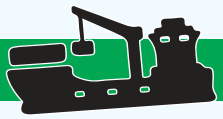

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনা সংকটেও রপ্তানি বেড়েছে ১৬ পণ্যে

করোনা সংকটে যখন বিশ্ব অর্থনীতি খাবি খাচ্ছে, তখন সদ্য সমাপ্ত অর্থবছর শেষে দেখা যাচ্ছে – অন্তত ১৬টি পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। লকডাউন, কারখানা বন্ধ এমনকি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ বাতিলের মতো নেতিবাচক সিদ্ধান্তগুলোও এসব খাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ইপিবির ৪ঠা আগস্ট প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী মহামারিতেও যে ১৬ পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সক্ষমতা দেখিয়েছে সেগুলো হলো – ওষুধ, প্রকৌশল যন্ত্রাংশ, পাট ও পাটজাত পণ্য, ফলমূল, কাঁচা পাট, শাকসবজি, জুতা (চামড়া ব্যতীত), জুট ইয়ার্ন অ্যান্ড টোয়াইন, গলফ সফট, তামাক, চা, কার্পেট, ফার্নিচার, হ্যান্ডিক্রাফটস, জাহাজ এবং অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং দ্রব্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে জাহাজ রপ্তানিতে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এই পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩৯ শতাংশ। এছাড়া ফলমূলে ৪৮ শতাংশ, কাঁচা পাটে ১৫ শতাংশ, শাকসবজিতে ৬৫ শতাংশ, চা ১১ শতাংশ, প্রকৌশল যন্ত্রাংশ ২৬ শতাংশ এবং ওষুধ রপ্তানিতে ৪৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রপ্তানিতে পোশাক খাতের সঙ্গে আরো চার পণ্যের সম্ভাবনা

দেশের রপ্তানিতে প্রধান পণ্য পোশাক খাতের পাশাপাশি আরো চারটি পণ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ওই খাতগুলো হচ্ছে– চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট, হালকা প্রকৌশল এবং তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি)। ২৩শে জুলাই ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) 'কোভিড-১৯ অ্যান্ড বাংলাদেশ ইকোনমি' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রিসার্স অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) এবং দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইআরএফ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন অর্থবছরে ৪৮ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি অবশ্যই সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। কারণ রপ্তানির প্রধান পণ্য পোশাক খাতের পাশাপাশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট, হালকা প্রকৌশল এবং আইটি খাতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্কুলের কার্যদিবসের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে তিন স্তরের সিলেবাস

একাধিক বিকল্প চিন্তা মাথায় রেখেই এবার প্রস্তুত করা হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সিলেবাস। স্কুল কবে নাগাদ খুলতে পারে মূলত তার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হচ্ছে সিলেবাস। এজন্য প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যসূচি নিয়ে কাজ করছে সিলেবাস-সংক্রান্ত পৃথক পৃথক উপকমিটি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) সংশোধিত সিলেবাস প্রস্তুতের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পাঠ্যসূচি কাটছাঁট করে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং প্রাথমিকের পাঠ্যসূচি করছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)। দুটি সংস্থাই জানিয়েছে, শিগগির এই পাঠ্যসূচি শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে। পরবর্তী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, করোনার কারণে বন্ধ থানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেপ্টেম্বরে খুললে তুলনামূলক একটু বড়ো আকারের পাঠ্যসূচি হবে। এক্ষেত্রে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাসের জন্য ৭০ থেকে ৭৩ কার্যদিবস পাওয়া যাবে। আর অক্টোবরে খুললে আরেকটু সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি হবে। এই সময়ে ৫০ কার্যদিবসে ক্লাস করা যাবে। আর যদি স্কুলগুলো নভেম্বরে খোলে একেবারেই সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি হবে। তখন ক্লাসের জন্য ৩০ কার্যদিবস পাওয়া যাবে। আবার যদি সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলে, তাহলে বিভিন্ন বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচিতে (সিলেবাস) এ বছরের পড়াশোনা শেষ করার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। এজন্য প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিন ধরনের বিকল্প পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হচ্ছে। আর পরীক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব আলোচনায় থাকলেও তা কবে এবং কীভাবে হবে, নাকি পরীক্ষা হবে না, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা জানান, স্কুল কবে খুলবে এবং কতটুকু বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নেওয়া যাবে সেটি নির্ধারণ করতেই একাধিক কমিটি কাজ করছে। ইতোমধ্যে কাজের অগ্রগতিও অনেক দূর এগিয়েছে। তবে প্রতিটি কমিটির তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো লিখিত আকারে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। কমিটিগুলোর প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচি এবং স্কুলের কার্যদিবসের ওপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রণালয়।

রেডিওতে প্রাথমিক পাঠদান কার্যক্রম উদ্‌বোধন

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার পর এপ্রিল থেকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর মাধ্যমে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করছে সরকার। অনেক পরিবারে টেলিভিশন সুবিধা না থাকায় সরকার রেডিও'র মাধ্যমে প্রাথমিকে পাঠদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ১২ই আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

করেন। বাংলাদেশ বেতার এবং ১৬টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে সারা দেশে প্রতি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে ৪.৪৫ মিনিট পর্যন্ত এ পাঠদান সম্প্রচার করা হচ্ছে। রেডিও এবং মোবাইল ফোনের রেডিও অপশনের মাধ্যমেও এ সম্প্রচার শোনা যাবে। এর মধ্যে ৯৬% শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা সম্ভব হবে বলে মনে করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের একাডেমিক যে-কোনো সমস্যা সমাধানে সরাসরি কথা বলা যাবে শিক্ষকদের সঙ্গে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

WHO-এর পরামর্শক হলেন বাংলাদেশের সেঁজুতি

বাংলাদেশের অণুজীববিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO)-এর পোলিও ট্রানজিশন ইনডিপেনডেন্ট মনিটরিং বোর্ডের (টিআইএমবি) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর মাধ্যমে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশিকে এই বোর্ডের সদস্য করা হলো। ১৭ই জুলাই চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (সিএইচআরএফ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বেসরকারি সংস্থা চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের বিজ্ঞানী সেঁজুতি সাহা মূলত বোর্ডের অন্য দুই সদস্যের সঙ্গে ডব্লিউএইচও'র মহাপরিচালক পর্যায়ে পোলিও সংক্রমণ প্রক্রিয়াটির অগ্রগতি বিষয়ে পরামর্শ দেবেন। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিআইএমবি প্রকল্প মূলত বিশ্বব্যাপী পোলিও রোগের বিস্তার রোধ নিয়ে কাজ করে। উল্লেখ্য, সেঁজুতির নেতৃত্বে একটি দল বাংলাদেশে প্রথম নভেল করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স (জিন নকশা) উন্মোচন করে।

জাতিসংঘের বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার হলেন আইরিন খান

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের বাক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক মহাসচিব আইরিন খান। ২৭ বছরের মধ্যে মানবাধিকার পরিষদ এই প্রথম কোনো নারীকে ঐ পদে নিয়োগ দিয়েছে। পরিষদে ৪৪তম অধিবেশনে তাঁকে এ নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭ই জুলাই পরিষদের ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই আগস্ট ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর গভর্নিং বডির সভায় যোগ দেন

আইরিন খান আগস্ট থেকে ওই পদে কাজ শুরু করবেন। সাধারণত কোনো বিশেষ বিষয়ের জন্য নিয়োগ পাওয়া বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়াররা তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। পরে আরো তিন বছরের জন্য তাঁদের মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে।

ট্রান্সকম গ্রুপের নতুন চেয়ারম্যান হলেন শাহনাজ রহমান

ট্রান্সকম গ্রুপের নতুন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপক পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন শাহনাজ রহমান। আর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) দায়িত্ব পেয়েছেন সিমিন রহমান। ২৬শে জুলাই ট্রান্সকম লিমিটেড এ তথ্য জানিয়েছে।

শাহনাজ রহমান ট্রান্সকম গ্রুপের পরিচালক হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ২০১৯ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশনের নারীদের মধ্যে শীর্ষ করদাতা হন, আর ২০১৭ সালে দীর্ঘ সময় ধরে করদাতা হওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর পরিবারকে 'কর বাহাদুর' ঘোষণা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

প্রতিবেদনঃ জান্নাতে রোজী

বিনিয়োগঃ বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ আরো আকর্ষণীয় করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) গভর্নিং বডির সভার প্রারম্ভিক ভাষণে দেশের অর্থনীতিকে আরো এগিয়ে নেওয়ায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের অর্থনীতি যাতে এগিয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে এবং আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশটাকে আরো আকর্ষণীয় করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আজকে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে সব দেশেরই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যার মধ্যে দিয়েই কীভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের বিনিয়োগ পরিবেশটাকে আকর্ষণীয় করতে হবে।

বিনিয়োগের জন্য যেসব পদক্ষেপ তাঁর সরকার নিয়েছে তার সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা কর অবকাশের সুবিধা দিয়েছি, সমগ্র বাংলাদেশে একশ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তাঁর সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশে ইতোমধ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, '২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশে আসা সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ২ দশমিক ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদেরকে আরো বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে হবে, এটার সুযোগ আছে। অনেক দেশে এখন ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ। আমাদের জনসংখ্যা আছে, জমি তৈরি আছে, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে। এই সুযোগটায় আমরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আরো বেশি আকর্ষণ করতে পারি এবং আনতে পারি। তিনি প্রাপ্ত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলায় আত্মনিবেদনের জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বায়োটেক খাতে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে চীনের ওরিক্স

বাংলাদেশে প্রথম বায়োটেক শিল্প খাতে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে চীনের ওরিক্স বায়োটেক হোল্ডিংসের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ওরিক্স বায়োটেক লিমিটেড। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি। ১১ই আগস্ট রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের মিলনায়তনে দেশের বায়োটেক শিল্প খাতে বিনিয়োগের জন্য সামিট টেকনোপলিস ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ওরিক্স বায়োটেক।

প্রতিবেদন : এইচ কে রায় অপু

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক করতে হবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষিতে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য জোগানো। দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ চাষযোগ্য জমি দ্রুত কমছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে রয়েছে। এর সাথে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে কোভিড-১৯। ফলে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা বা ফুড চেইনকে চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষি গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হবে। যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক কারিকুলামের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। ৮ই আগস্ট তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দক্ষ কৃষি গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে আধুনিক কারিকুলামের ভূমিকা শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করতে হলে কৃষিপণ্যের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কৃষিপণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করতে হবে। সেজন্য, উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাস ও কারিকুলাম যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাণিজ্যিক কৃষি কৌশল জ্ঞান সংবলিত সিলেবাস প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

কর্মকর্তাদের দ্রুত সরেজমিনে মাঠ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ

বন্যায় কৃষকের ক্ষতি পোষাতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অতি দ্রুত বন্যাপ্লাবিত এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি ও মনিটরিং করার নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক । তিনি বলেন, চলমান বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা চরম অনিশ্চয়তায় আছে। বন্যার পানি নেমে গেলে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি পুনর্বাসন ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কাজ করতে হবে। সেজন্য বীজ, সারসহ বিভিন্ন প্রণোদনা কার্যক্রম বেগবান, তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য ইতোমধ্যে ১৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও নিয়মিত কাজের সাথে মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ের কাজের তদারকি করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সরেজমিনে মাঠ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও প্রণোদনা কার্যক্রম মনিটরিং করলে এসব কাজে আরও গতি আসবে। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা যাবে। ৪ঠা আগস্ট কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঈদুল আজহা পরবর্তী পুনর্মিলনী সভায় অনলাইনে এসব কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান।

প্রতিবেদনঃ এনায়েত হোসেন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার 'পাকা ঘরে' উঠলেন নাজিম উদ্দিন

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার পাকা ঘরে উঠেছেন শেরপুরের ঝিনাইগাতীর গান্ধিগাঁও গ্রামের সেই ভিক্ষুক নাজিম উদ্দিন। ভিক্ষা করে ঘর মেরামতের জন্য জমানো ১০ হাজার টাকা করোনার দুঃসময়ে কর্মহীন মানুষের জন্য ত্রাণ তহবিলে দান করে প্রধানমন্ত্রীর নজরে আসেন ভিক্ষুক নাজিম উদ্দিন। তার মহানুভবতায় খুশি হয়ে পাকা বাড়ি করে দেওয়ার নির্দেশ দেন সরকারপ্রধান। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও দেওয়া হয় সম্মাননা, জীবিকার জন্য দেওয়া হয়েছে দোকান। জীর্ণ মাটির ঘর ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পাকা ঘরে উঠেছেন তিনি। ১৬ই

আগস্ট নতুন ঘরের চাবি তার হাতে তুলে দিয়েছেন জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রধানমন্ত্রীর কোটি টাকা অনুদান

আসন্ন 'প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দানোৎসব' উদ্‌যাপন করতে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে ১ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ১৭ই আগস্ট এ অনুদান দেওয়া হয় বলে গণমাধ্যমকে জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। তিনি আরো জানান, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়মিতভাবে সব ধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতা করে থাকেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী এ অনুদান দেন, যাতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মীয় উৎসবটি ভালোভাবে পালন করতে পারেন। আগামী ১লা অক্টোবর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হবে। দেশের প্রতিটি বৌদ্ধ বিহার, মন্দির, ক্যাং, চৈত্য ও প্যাগোডায় ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে আগস্ট ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ১১টি গ্রিড উপকেন্দ্র, ৬টি নতুন সঞ্চালন লাইন এবং ১৮ জেলার ৩১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

৩১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৮ জেলার ৩১টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন, ২টি পাওয়ার প্ল্যান্ট, ১১টি গ্রিড সাবস্টেশন, ৬টি নতুন সঞ্চালন লাইন উদ্‌বোধন করেন। শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলাগুলো হচ্ছে– ঝিনাইদহের সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর, সরাইল, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ ও কচুয়া, কুমিল্লার বরুড়া ও মুরাদগঞ্জ, ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও বোয়ালমারী, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর, মানিকগঞ্জের সদর, দৌলতপুর, সিঙ্গাইর ও শিবালয়, মৌলভীবাজারের রাজনগর, নওগাঁর মান্দা, ধামরহাট, সাপাহার, নীলফামারির ডোমার, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ, রাজবাড়ির রাজবাড়ি সদর ও বালিয়াকান্দি, রাজশাহীর বাঘমারা, সাতক্ষীরার সদর, সিলেটের জকিগঞ্জ এবং মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলা। এছাড়াও কনফিডেন্স পাওয়ার বগুড়া-১ লিমিটেডের ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং নোয়াখালীর এইচএফ পাওয়ার লিমিটেডের ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহাস্থানগড় ১৩২/৩৩ কেভি, রাজশাহী (উত্তর) ১৩২/৩৩ কেভি, চৌদ্দগ্রাম ১৩২/৩৩ কেভি, ভালুকা ১৩২/৩৩ কেভি, বেনাপোল ১৩২/৩৩ কেভি এবং শরীয়তপুর ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন উদ্‌বোধন করেন।

৪০০/২৩০/১৩ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শ্যামপুর ২৩০/১৩২ কেভি সাবস্টেশন, পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় গ্রিড সাবস্টেশন এবং সঞ্চালন জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় শেরপুর ১৩২/৩ কেভি ও কুড়িগ্রাম ১৩২/৩৩ কেভি, পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের আওতায় নড়াইল ১৩২/৩৩ কেভি এবং রাজেন্দ্রপুর ১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস (গ্যাস ইনসুলেইটেড সুইসগিয়ার) প্রকল্পের আওতায় রাজেন্দ্রপুর ১৩২/৩৩ সাবস্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২৬শে জুলাই জাতীয় সংসদ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। স্পিকার এসময় একটি আম, একটি অশোক ও একটি নাগেশ্বর গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন।

এসময় স্পিকার বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে বৃক্ষরোপণ অন্যতম। এসময় তিনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ায় সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি আরো বলেন, পর্যায়ক্রমে সকল সংসদ সদস্যবৃন্দ সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৩৫০ থেকে ৫০০টি বৃক্ষের চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সংসদ ভবন চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বিশ্বে স্বীকৃত

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত। ২৭শে জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১০০টি গাছের চারা রোপণ

কার্যক্রমের উদ্‌বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দেশব্যাপী এক কোটি গাছের চারা রোপণের অংশ হিসেবে এসব রোপণ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণ, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা এবং সুগন্ধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গাছের চারা রোপণ করা হয়। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনও গাছের চারা রোপণ করেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি নাগেশ্বর চাঁপাগাছ, পররাষ্ট্র সচিব একটি সোনালু গাছ রোপণ করেন।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক

বিশাল আকাশের নিচে বিস্তৃত এক অপরূপ সাজে সেজেছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক। এর পাশ দিয়ে চলে গেছে ঘুমধুমের আঁকাবাঁকা রাস্তা। বালুখালী কাস্টমস ঘেঁষে

বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়কটিতে প্রাত ভ্রমণে আসেন অনেকেই। উখিয়া বালুখালী আর নাইক্ষ্যংছড়ির উপজেলা ঘুমধুমের বিস্তৃত ভূমি নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক। কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কের উখিয়ার ঘাট হয়ে প্রবেশপথ। এশিয়ান হাইওয়ের ট্রান্স রোডের অংশ হিসেবে দুই কিলোমিটার সড়কের ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য প্রসারে সড়ক নির্মাণ করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে এ সড়ক চালু না হলেও পর্যটন স্পট হিসেবে এটি ইতোমধ্যে প্রসার লাভ করেছে। নানা রঙের বাহারি সাজে সেজেছে এটি। মিয়ানমারের সীমান্ত কাঁটা তারের বেড়া, এই সড়কটির আশপাশে পাহাড় ও লতাপাতায় ঘেরা সড়ককে দিয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। অনেকেই এখানে বেড়াতে আসেন। সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা একেক সময়ে একেক রূপে দেখা দেয় মৈত্রী সড়ক। আকাশে কখনো সাদা মেঘের ভেলা, কখনো কালো মেঘের আনাগোনা, কখনো ধূসর আর গোধূলি বেলায় আবিরের রঙে সাজে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়কের আকাশ। সন্ধ্যায় আকাশের আবিরের রং প্রতিফলিত হয় নিচের বিশাল সড়কের ওপর। সবমিলে এ অসাধারণ দৃশ্যের দেখা মেলে সেখানে। ওখানে দিগন্তজুড়ে দেখা মেলে সবুজের আলপনা। তাই সড়ক নিরিবিলি পরিবেশ দেখতে ভ্রমণ পিপাসুরা এখানেই চলে আসে।

ঈদুল আজহার আগে-পরে ১৪ দিন সড়কে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ

সারা বিশ্ব এখন করোনা নামক এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এ কারণে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পড়েছে। এক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থে ঈদুল আজহার আগের সাত দিন ও পরের সাত দিন ফ্লাইওভার-আন্ডারপাসসহ চলমান সকল কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। ২২শে জুলাই তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে সড়ক-মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ দেন তিনি।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণাধীন ফ্লাইওভার-আন্ডারপাসসহ চলমান কাজ জনস্বার্থে ঈদের আগের সাত দিন ও পরের সাত দিন বন্ধ রাখা হয়। নবীনগর, বাইপাইল, ইপিজেড, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ভুলতা, কাঁচপুর এলাকায় অসংখ্য গার্মেন্টস থাকায় ঘরমুখী মানুষের প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়। তাই এই চাপ সঠিকভাবে সামলাতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিজিএমইএ-এর সঙ্গে সমন্বয় করতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

কর্মসংস্থানের নতুন উদ্যোগ

নতুন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, পল্লী কর্মসংস্থান ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। ২রা আগস্ট অর্থ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে অনেক কর্মী বেকার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। তাদের সহায়তা দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার কোটি টাকার একটি ফান্ড গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারই আলোকে বাজেট থেকে এই অর্থ বরাদ্দ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগ থেকে এই অর্থ ছাড় দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু যুব ঋণের চেক বিতরণে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে কর্মসংস্থান ব্যাংক। এই কর্মসূচিতে দুই লাখ প্রশিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ব্যাংকের মানিকগঞ্জ শাখার উদ্যোগে ১০ই আগস্ট ব্যাংক শাখা ভবনে প্রশিক্ষিত যুবকদের মাঝে এই চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাকিয়া সুলতানা, যুগ্মসচিব এবং ব্যাংকের পরিচালক কামরুন নাহার সিদ্দীকা এবং ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল মান্নান উপস্থিত

ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তাজুল ইসলাম।

বিদেশে কর্মসংস্থান বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার

প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রতি উপজেলায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে বছরে এক হাজার যুবক-যুবতীর বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে প্রচার, প্রেস ব্রিফিং ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা পরিষদ হলরুমে ১০ই আগস্ট উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ইউএনও ঝোটন চন্দের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এম মোশাররফ হোসেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ রাসেল রেজা।

ইউএনও প্রেস বিফ্রিংয়ে বলেন, দেশের ৭০টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক ষষ্ঠী পদ রায় জানান, বিদেশগামীরা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বিদেশে না যাওয়ার কারণে ভালো কাজ পায় না। টাকা-পয়সার সব লেনদেন বৈধ রসিদে করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার কুয়েত যেতে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত যেতে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৭৮০ টাকা, মালয়েশিয়ায় নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে ১ লক্ষ ৬০ হাজার এবং কৃষি শ্রমিক ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

প্রতিবেদন : ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কোভিড-১৯-এর চিকিৎসক ও নার্সদের জন্য আবাসন সুবিধা

কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আর আবাসিক হোটেলে থাকতে হবে না। ঢাকা মহানগরে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নির্ধারিত ছয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকতে পারবেন। আর ঢাকার বাইরের জেলা-উপজেলার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারি প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবেন,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগ ২৩শে জুলাই সংবাদ মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

এ সংক্রান্ত আদেশ জারির খসড়ায় বলা হয়েছে, কেউ সরকারি আবাসন সুবিধা গ্রহণ করতে না চাইলে ভাতা পাবেন। ঢাকা মহানগরের একজন চিকিৎসক দৈনিক ২ হাজার টাকা, নার্স ১ হাজার ২০০ টাকা এবং অন্যরা ৮০০ টাকা করে পাবেন। ঢাকার বাইরে চিকিৎসক ১ হাজার ৮০০ টাকা, নার্স ১ হাজার টাকা এবং অন্যরা ৬৫০ টাকা করে পাবেন। কেউ এক মাসে ১৫ দিনের বেশি এ ভাতা পাবেন না।

ঢাকা মহানগরে ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে আবাসন সুবিধার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) একাডেমি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, ন্যাশনাল একাডেমি অব এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের তিনটি ধরন সক্রিয়

বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের মূলে রয়েছে ভাইরাসের তিনটি ধরন– জি, জিএইচ ও জিআর। করোনা ভাইরাসের জিনের কাঠামো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এটা জানতে পেরেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৯ই আগস্ট করোনা বিষয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাংলাদেশের সংক্রমণ ঘটাচ্ছে মূলত জি (জি ক্লেড) করোনা ভাইরাস। তবে এগুলোর সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা অনেক বেশি কি-না, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এতে আক্রান্ত হলে মৃত্যু হবেই– এমন নজির দেখা যাচ্ছে না। এই ভাইরাসের জিন কাঠামোতে নিয়মিত পরিবর্তন বা মিউটেশন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ধরন চিহ্নিত করতেই করোনা ভাইরাসকে এল,এস,ভি,জি-এরকম নানা ভাগে ভাগ করছেন অণুজীব বিজ্ঞানীরা। ভাইরাসের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য জানা-বোঝার জন্য এই তথ্য জরুরি। সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এই তথ্য কাজে লাগবে।

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

রেল ভ্রমণে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক নয়

রেল ভ্রমণে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শনের বিষয়টি শিথিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রণালয়। ২০শে আগস্ট

মন্ত্রণালয়ের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। একইসঙ্গে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে পরিবারের সর্বোচ্চ চার সদস্যের টিকিট কেনা ও ভ্রমণ করা যাবে বলেও জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৩ই আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ

রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে যাত্রীগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক এনআইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে। এর আগে ১৩ই আগস্ট রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়েছিল, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য কেনা টিকিট, যাত্রার স্থান থেকে ফেরার টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। একজনের টিকিটে অন্য কেউ ভ্রমণ করলে তাকে টিকিটের সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে। এমনকি তাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনলাইন বা মোবাইল অ্যাপ থেকে নিজ নিজ টিকিট কেটে যাত্রীদের রেল ভ্রমণ এবং অন্যের টিকিটে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।

টিকিট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য রেলওয়ে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি ও পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে নেওয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে। রেলওয়ের টিকিট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা সয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। নতুন ব্যবস্থার নামকরণ করেছে রেলওয়ে 'টিকিট যার, ভ্রমণ তার'। যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) হয়নি, তারা জন্মনিবন্ধন নম্বর দিয়ে টিকিট কাটতে পারবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গমাতার জন্মদিন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী ছিল ৮ই আগস্ট। ১৯৩০ সালের এই দিনে গোলাপগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তিনি জাতির পিতার হত্যাকারীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে। এর আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল– 'বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক'। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন এ অনুষ্ঠানে। জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই আগস্ট ২০২০ গণভবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়িতা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'জয়তু বঙ্গমাতা' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন–পিআইডি

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস

বাইশে শ্রাবণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৯তম প্রয়াণ দিবস। ৭৯ বছর আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বাঙালির সংস্কৃতিসত্তার বাতিঘর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষা ঋতুকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এই ঋতু নিয়ে তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ রয়েছে। সেই বর্ষাতেই চির বিদায় নেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জীবনে সাহিত্যের এমন বিচিত্র এক জগৎ রচনা করেছেন– যা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের আসর করেছেন মহিমান্বিত। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তাঁর নোবেলপ্রাপ্তি বাংলা সাহিত্যেকে বিরল গৌরব এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব যাঁর লেখা গান বাংলাদেশ ও ভারত– দুই দেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে মনোনীত হয়েছে। করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে ২২শে শ্রাবণে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক আয়োজন করা হয়নি। তবে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

দিল্লি উৎসবে নোলক ও মায়া

করোনাকালে বাতিল হয়েছে বহু চলচ্চিত্র উৎসব। তবে বেশ কিছু উৎসব অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে। সেই পথে হাঁটল দিল্লির ইন্দুস ভ্যালি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ১লা

আগস্ট থেকে অনলাইনে উৎসবটি শুরু হয়। এ উৎসব ৯ই আগস্ট শেষ হয়। বাংলাদেশ থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্য দুটি সিনেমা এ উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এতে পপুলার ক্যাটাগরিতে বাণিজ্যিক সিনেমা হিসেবে সাকিব সনেট পরিচালিত শাকিব-ববির *নোলক*

এবং ফিচার ফিল্ম সেকশনে মাসুদ পথিকের মায়া– *দ্য লস্ট মাদার* মনোনীত হয়। এতে অভিনয় করেন– জ্যোতিকা জ্যোতি, প্রাণ রায় প্রমুখ।

আসাদুজ্জামান নূর ও তারানা হালিমের প্রথম ছবি

একসময় টিভির জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন আসাদুজ্জামান নূর ও তারানা হালিম। রাজনীতিতে আসা এই তারকা দুজনেই সফল। অভিনয়ে আসাদুজ্জামান নূর এবং তারানা হালিমের কোনো জুড়ি নেই। দর্শক জনপ্রিয়তা ছিল দুজনেরই। প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধে হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় এ দুই তারকা। টুঙ্গিপাড়ার দুঃসাহসী খোকা বঙ্গবন্ধুর জীবনীর ওপর নির্মিত হবে চলচ্চিত্রটি। এ সিনেমায় বঙ্গবন্ধুর বাবা ও মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন নূর-তারানা। সরকারি অনুদানে সিনেমাটি নির্মাণ করছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। এ ছবির জন্য ৭০ লাখ টাকা অনুদান পাবেন পরিচালক গুলজার।

২১ ঘণ্টার চলচ্চিত্র *আমরা একটা সিনেমা বানাবো*

পাবনা শহরের রূপকথা সিনেমা হলে ২১ ঘণ্টার চলচ্চিত্র *আমরা একটা সিনেমা বানাবো* প্রদর্শিত হয়। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা আশরাফ শিশিরের ২১ ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র *আমরা একটা সিনেমা বানাবো*। ইতোমধ্যেই এ ছবিটি বিশ্বের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফিকশন চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯শে জুলাই পাবনা ফিল্ম সোসাইটির আয়োজনে চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে পাবনার একমাত্র প্রেক্ষাগৃহ রূপ কথা সিনেমা হলে দুই দিনব্যাপী চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। সম্পূর্ণ সাদা কালোয় নির্মিত চলচ্চিত্রটির কাহিনি গড়ে উঠেছে এমন এক জনপদকে ঘিরে, যেখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে কয়েকজন নিষ্পাপ মানুষের জীবনী নিয়ে বিপ্লবী হয়ে ওঠা এবং স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প। এ চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে ১০ বছর।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে ওসিদের সরিয়ে দেওয়া হবে

মাদক ব্যাবসায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে সফল পুলিশ সদস্যদের পুরস্কার দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএমপি। ১২ই জুলাই ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমে এসব কথা জানান। ঢাকার মাদক নির্মূল করতে ও নিয়ন্ত্রণে আনতে ডিএমপি কমিশনার মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করার পাশাপাশি নানামুখী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিয়েছেন। ডিএমপি'র সব বিভাগের উপকমিশনারের কাছে এই বার্তা গেছে। ডিএমপি'র সব মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের এই কঠোর বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে সরিয়ে দেওয়া হবে। হাত বাড়ালেই মাদক মিলবে আর পুলিশ চাকরি করবে– তা হবে না। সব অপরাধের মূল হলো মাদক। মাদক নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অপরাধও কমে আসবে।

জুলাই মাসে ৫০ কোটি টাকার চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বিজিবি

দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে জুলাই মাসে ৫০ কোটি ৪২ লাখ ৯৭ হাজার টাকার মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। বিজিবি'র জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে– ৯ লাখ ৪১ হাজার ৩৮০ পিস ইয়াবা, ৫৪ হাজার ৭৯৩ বোতল ফেনসিডিল, ৫ হাজার ৯৩১ বোতল বিদেশি মদ, এক হাজার ৬১৪ ক্যান বিয়ার, এক হাজার ২১৬ কেজি গাঁজা, দুই কেজি ৩৭০ গ্রাম হেরোইন, ১৫ হাজার ৭৭১টি উত্তেজক ইনজেকশন, ৭ হাজার ৫৬৭টি অ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট এবং ৮ লাখ ৯৪ হাজার ৭টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থের পাঠ কার্যক্রম উদ্‌বোধন

চলতি বছরের ১৭ই মার্চ জন্মশতবর্ষে পদার্পণ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিববর্ষ এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম গ্রহণ করে গ্রন্থকেন্দ্র। এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা তিনটি বই

পড়বে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা। 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই/সোনার মানুষ হই'– শিরোনামের কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা পাঠ করবে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন*। ৯ই আগস্ট গুলিস্তানের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সভাকক্ষে ৪ মাসব্যাপী এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১০টি বেসরকারি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে কার্যক্রমের সূচনা হয়। পর্যায়ক্রমে এ পাঠ কার্যক্রমকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ৮০০টি গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ও সরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সহযোগিতায় এ বিষয়ে পরবর্তীতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে গ্রন্থকেন্দ্র।

স্মার্টফোন কেনার সামর্থ্য নেই এমন শিক্ষার্থীদের তালিকা চেয়েছে ইউজিসি

ভার্চুয়াল ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি নেই–এমন শিক্ষার্থীদের তালিকা চেয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ২৫শে আগস্টের মধ্যে এই তালিকা পাঠাতে হবে। ৯ই আগস্ট দেশের ৪৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ২৫শে জুন উপাচার্যদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভা করে ইউজিসি। উপাচার্যদের মতামতের ভিত্তিতে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যাতে সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেলক্ষ্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট, বিনামূল্যে ডাটা সরবরাহ এবং সহজ ঋণে স্মার্টফোন সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে কমিশন থেকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গমাতার জন্মদিন উপলক্ষে গরিব ও বেকার মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

'বঙ্গমাতা ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার ৯০তম জন্মদিন উপলক্ষে দুস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। ৮ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে রাঙামাটি পার্বত্য জেলার সাংসদ দীপংকর তালুকদার রাঙামাটির সদর উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ও রাঙামাটি পৌরসভার গরিব ও বেকার মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ১১০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।

রাঙামাটি পিসিআর ল্যাবের উদ্‌বোধন

দেশের করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে রাঙামাটিতে করোনা পরীক্ষার জন্য পিসিআর ল্যাবের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ৬ই

আগস্ট বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে রাঙামাটি মেডিক্যাল কলেজ ভবনে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবের উদ্‌বোধন করেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী। এছাড়া করোনা চিকিৎসা সেবা বাড়াতে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে যোগ হয়েছে একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স। স্থাপিত পিসিআর ল্যাবের সাহায্যে দুই শিফটে নমুনা পরীক্ষা করলে প্রতি শিফটে ১০০ করে দৈনিক মোট ২০০ জনের করোনা নমুনা পরীক্ষা করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা পেল বান্দরবানের সাংবাদিকরা

বান্দরবানে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের মধ্যে ৬ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়েছে। বান্দরবানের হিলটন আবাসিক হোটেলের সভাকক্ষে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আয়োজনে প্রেস ইউনিট বান্দরবানের সহযোগিতায় প্রধানমন্ত্রীর এ আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি। এসময় জেলার ২৯ জন সাংবাদিককে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

৪৬১ জন প্রতিবন্ধী পেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার পেয়েছেন সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের ৪৬১ জন প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবার। ৩০শে জুলাই রামপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে

প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মশিউর রহমান, এনডিসি। সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নে সামগ্রিক হারের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি প্রতিবন্ধী রয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই আমতৈল গ্রামের। বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিতে আনেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং তাদের ঈদ উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী শিশুদের সুস্থতা ও সুস্থ আগামী প্রজন্ম নিশ্চিতের লক্ষ্যে বেশ কিছু নির্দেশনা দেন।

ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রত্যেককে নগদ দুই হাজার ৫০০ টাকা, তাদের পরিবারকে একটি করে লুঙ্গি ও শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। এ সময় ১০ কেজি চাল, ১ কেজি করে ডাল, লবণ, চিড়া, চিনি, তেল এবং ৫০০ গ্রাম নুডলস প্রদান করা হয়। এছাড়া ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৪৬১ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে বরাদ্দের জন্য ১৬ লাখ ১৩ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কবিরহাটে প্রতিবন্ধীরা পেল হুইল চেয়ার ও নগদ অর্থ সহায়তা

নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় ৪০ জন প্রতিবন্ধী শিশু, নারী ও বয়স্কদের মাঝে হুইল চেয়ার ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। ৪ঠা আগস্ট মানবিক পুলিশ ইউনিট সিএমপি ও নোয়াখালী জেলা পুলিশের আয়োজনে কবিরহাট থানা হলরুমে প্রতিবন্ধী শিশু, নারী ও বয়স্কদের মাঝে হুইল চেয়ার ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, পুলিশ আইনশৃঙ্খলার পাশাপাশি নানা ধরনের মানবিক কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে আজ মানবিক দায়িত্ব হিসেবে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিশ।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

অনুশীলন শুরু করছেন নারী ক্রিকেটাররা

বিসিবির তত্ত্বাবধানে একক অনুশীলনে পুরুষ ক্রিকেটারদের পর এবার যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের কয়েকজন। দেশের তিন ভেন্যুতে ১০ই আগস্ট থেকে অনুশীলন শুরু করেছেন ৯ নারী ক্রিকেটার। নারী ক্রিকেটারদের যোগ করে ৯ই আগস্ট রাতে নতুন সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি। মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছেন ব্যাটার শারমিন আক্তার সুপ্তা, কিপার-ব্যাটার শামিমা সুলতানা, পেসার জাহানারা আলম, পেস বোলিং অলরাউন্ডার লতা মণ্ডল ও বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তার। খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছেন দুই অলরাউন্ডার বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক রুমানা আহমেদ ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সালমা খাতুন। বগুড়ায় অনুশীলন করবেন অফ স্পিনার খাদিজা তুল কুবরা ও ব্যাটার শারমিন সুলতানা।

ঘরের মাঠে ভারতকে হারানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৩ সালের এশিয়ান কাপের বাছাই পুনরায় শুরু হবে আগামী অক্টোবরে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে বাংলাদেশ। ১৩ই অক্টোবর বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারের মাঠে খেলতে যাবে জেমি ডের দল। ১৭ই নভেম্বর ফিরতি পর্বের ম্যাচে নিজেদের মাঠে মুখোমুখি হবে ভারতের; এই দলটির বিপক্ষে ১-১ ড্রয়ে এখন পর্যন্ত একমাত্র পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ। বাফুফের ১৮ই জুলাইয়ের পাঠানো বার্তার মাধ্যমে নিজেদের মাঠে ভারতকে হারানোর আশাবাদ জানান সাদউদ্দিন।

তারিকসহ বসুন্ধরা কিংসের ১৪ জন জাতীয় দলে

বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের বাছাই ক্যাম্পের জন্য বাংলাদেশের ৩৬ জনের প্রাথমিক দলে ডাক পেয়েছেন ফিনল্যান্ড প্রবাসী কাজী তারিক রায়হান। বসুন্ধরা কিংসের এই ফুটবলার ছাড়াও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ঘোষিত দলে আরও তিন নতুন মুখ রয়েছে। সুযোগ পেয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশ এফসির হয়ে খেলা মিডফিল্ডার নাজমুল হোসেন ও ফরোয়ার্ড এমএস বাবলু এবং সুমন রেজা। চোট কাটিয়ে ফিরেছেন বসুন্ধরা কিংসের দুই মিডফিল্ডার আতিকুর রহমান ফাহাদ, মাশুক মিয়া জনি। প্রাথমিক দলে বসুন্ধরা কিংসের ১৪ জন, আবাহনী লিমিটেড ও সাইফ স্পোর্টিংয়ের ৭ জন করে, চট্টগ্রাম আবাহনীর ৩ জন, শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ও বাংলাদেশ পুলিশ এফসির ২ জন করে এবং উত্তর বারিধারার ১ জন সুযোগ পেয়েছেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে সুরকার আলাউদ্দিন আলী

আফরোজা রুমা

ঢাকাই চলচ্চিত্রের বহু হৃদয়কাড়া গানের গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী না ফেরার দেশে চলে গেলেন। মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৯ই আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

আলাউদ্দিন আলীর জন্ম ১৯৫২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের টঙ্গিবাড়ী থানার বাঁশবাড়ী গ্রামে এক সাংস্কৃতিক পরিবারে। বাবা ওস্তাদ জাবেদ আলী। মা জোহরা খাতুন। মাত্র দেড় বছর বয়সে ঢাকার মতিঝিলের এজিবি কলোনিতে চলে আসেন পরিবারের সঙ্গে। তিন ভাই, দুই বোনের সঙ্গে কলোনিতেই বড়ো হতে থাকেন তিনি। সংগীতে প্রথম হাতেখড়ি ছোটো চাচা সাদেক আলীর কাছে। শহিদ আলতাফ মাহমুদের সহযোগী হিসেবে তিনি যন্ত্রশিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রজগতে আসেন। এরপর তিনি প্রখ্যাত সুরকার আনোয়ার পারভেজসহ বিভিন্ন সুরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন ১৯৬৮ সালে। ১৯৭৫ সালে সংগীত পরিচালনা করে বেশ প্রশংসিত হন। *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৯), *সুন্দরী* (১৯৮০), *কসাই* ও *যোগাযোগ* চলচ্চিত্রের জন্য ১৯৮৮ সালে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে। লোকজ ও ধ্রুপদী গানের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে তাঁর সুরের নিজস্ব ধারা বাংলা গানকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। প্রায় চার দশক বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে বহু স্বনামধন্য শিল্পী তাঁর সুরে গান করে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ঝুলিতে জমা হয়েছে ৮টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ১৯৮৭ সালের ২৬শে জুলাই একই দিনে তাঁর সুর-সংগীতে ৩০টি গানের রেকর্ডিং হয় মুম্বাই, কলকাতা ও ঢাকায়– এমন উদাহরণ বিশ্বের খুব বেশি সংগীত পরিচালকের ক্যারিয়ারে নেই।

তাঁর সুর করা গানের মধ্যে রয়েছে– 'ও আমার বাংলা মা তোর', 'সূর্যোদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি','যে ছিল দৃষ্টির সীমানায়', 'ভালোবাসা যত বড়ো জীবন তত বড়ো নয়', 'এই দুনিয়া এখন তো আর', 'আছেন আমার মোক্তার', 'শত জনমের স্বপ্ন তুমি আমার জীবনে এলে', 'সুখে থাকো ও আমার নন্দিনী', 'যেটুকু সময় তুমি থাকো কাছে', 'এমনও তো প্রেম হয়', 'কেউ কোনোদিন আমারে তো কথা দিল না', 'পারি না ভুলে যেতে','জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো', 'একবার যদি কেউ ভালোবাসত', 'দুঃখ ভালোবেসে প্রেমের খেলা খেলতে হয়', 'বাবা বলে গেল আর কোনোদিন', 'বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম', 'শেষ করো না শুরুতে খেলা', 'ইস্টিশনের রেলগাড়িটা'। এরকম প্রায় ৪ হাজার সফল গানের সুরকার ও সংগীত পরিচালক আলাউদ্দিন আলী।

বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক ও সুরকার আলাউদ্দিন আলীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন। আমরাও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 03, September 2020, Tk. 25.00

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

ফটোফিচার: ফরিদ হোসেন

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd